

চুম্বক

প্রকাশক

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ মল্লীক

ইণ্ডিয়ান প্রেস (পাবলিকেশন্স) লিমিটেড—কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান :—

ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্,

২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিণ্টার—

শ্রীপিয়ারেলাল যাদব

ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ

চুম্বক

রায়-সাহেব

শ্রীজগদানন্দ রায়-প্রণীত

প্রকাশক—

ইণ্ডিয়ান প্রেস (পাবলিকেশন্স) লিমিটেড—এলাহাবাদ,

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস্—২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

 ১৯৫৩ [মূল্য ৸৹ বারো আনা

নিবেদন

"চুম্বক" প্রকাশিত হইল। অতি সরল ভাষায় চুম্বক-ধর্ম্মের মোটামুটি বিষয়গুলি এই পুস্তকে আলোচনা করিয়াছি। আমাদের বালক বালিকারা এবং অবৈজ্ঞানিক পাঠক সাধারণ ইহা পড়িয়া যাহাতে বিষয়গুলির একটা ধারণা করিতে পারেন, রচনাকালে সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

বিশ্বভারতীর কলাভবনের কৃতী ছাত্র শ্রীমান্ রামকিঙ্কর বেইজ্ পুস্তকের প্রচ্ছদ-পট্ আঁকিয়া দিয়াছেন। এই সুযোগে তাঁহাকে এবং প্রকাশক ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্‌কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শান্তিনিকেতন
(বীরভূম,)
আশ্বিন, ১৩৩৫

শ্রীজগদানন্দ রায়

সূচীপত্র

চুম্বক

—:০:—

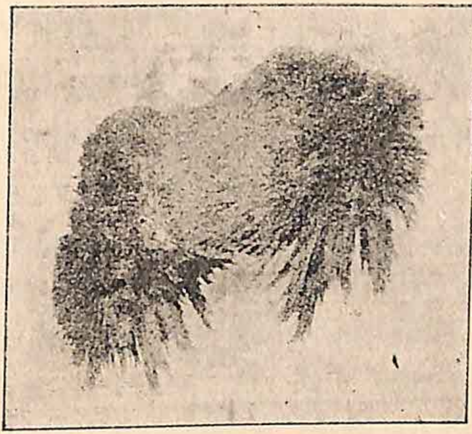
প্রথম কথা

চুম্বক যে লোহাকে টানে, ইহা আমাদের দেশের এবং অন্য দেশের লোকেরা অনেক আগে থাকিতে জানিতেন। এ-দেশের পণ্ডিতেরা চুম্বককে বলিতেন, অয়স্কান্ত মণি। চীনদেশের পাঁচ হাজার বৎসর আগেকার পুঁথিতে চুম্বকের কথা লেখা আছে। আমরা ছেলেবেলায় গল্প শুনিয়াছি, কোন্ সওদাগর নাকি

এক সময়ে জাহাজ-বোঝাই মাল-পত্র লইয়া সমুদ্র পার হইতেছিলেন। সমুদ্রের তলায় ছিল চুম্বকের পাহাড়। তাই সেই পাহাড়ের টানে জাহাজের লোহার পেরেক খুলিয়া গেলে সেখানি হঠাৎ ডুবিয়া গিয়াছিল। সমুদ্রের তলায় প্রকাণ্ড চুম্বকের পাহাড় আছে কিনা জানি না। তবে জায়গায় জায়গায় মাটির তলায় এক রকম পাথর (Lode Stone) পাওয়া যায়, ইহা লোহাকে টানে। এই আকরিক চুম্বক লোহা ও অক্সিজেনে মিশানো এক রকম যৌগিক জিনিষ। মাটির তলায় এগুলি আপনিই উৎপন্ন হয়।

বাজারে দুই-আনা চারি-আনা দামে চুম্বক কিনিতে পাওয়া যায়। তাহাদের কোনোটার আকৃতি লম্বা, কোনোটা বা ঘোড়ার পায়ের নালের মতো বাঁকানো। এই-সব চুম্বক লোহার পেরেককে ও ছুঁচকে টানিয়া ধরে। আমরা ছেলেবেলায় এই রকম চুম্বক দিয়া অনেক খেলা করিয়াছি। তোমরাও বোধ করি করিয়াছ। কিন্তু মনে রাখিয়ো, এই-সব চুম্বক আকরিক চুম্বক নয়। এগুলি ভালো ইস্পাত দিয়া তৈয়ারী। নানা উপায়ে ইস্পাতকে চুম্বক করা যায়। সে-সব কথা তোমাদিগকে পরে বলিব। তাহা শুনিলে তোমরা

নিজেরাই চুম্বক তৈয়ারী করিতে পারিবে। এখানে একটা চুম্বক পাথরের অর্থাৎ আকরিক চুম্বকের ছবি



আকরিক চুম্বক

দিলাম। দেখ, লোহার গুঁড়ার মধ্যে ডুবাইয়া রাখায় গুঁড়াগুলিকে গায়ে টানিয়া রাখিয়াছে।

তোমরা বোধ করি মনে করিতেছ, পৃথিবীতে এত জিনিষ থাকিতে আজ তোমাদিগকে চুম্বকের কথা বলিতে যাইতেছি কেন। ইহার কারণ আছে। আজকাল তোমরা যে বিদ্যুতের মোটর, বিদ্যুতের আলোর কল, টেলিগ্রাফ্, টেলিফোন্ ইত্যাদি দেখিতেছ,

তাহাদের সকলই চুম্বকের টানে চলে। সেই-সব কল কি-রকমে তৈয়ারী করা হয় এবং তাহাদের ভিতরেই বা কি আছে, ইহা তোমাদের জানিতে ইচ্ছা হয় না কি? চুম্বকের গুণ না বুঝিলে ঐ-সব কলের কাজও তোমরা বুঝিতে পারিবে না। তাই তোমাদিগকে প্রথমে চুম্বকের কথা বলিব।

চুম্বকের প্রধান গুণ

চুম্বক লোহাকে টানে তোমরা হয় ত অনেকেই তাহা দেখিয়াছ। লোহা ছাড়া নিকেল, কোবাল্ট প্রভৃতি অন্য কয়েকটি ধাতুকেও চুম্বক টানিয়া কাছে আনে। নিকেল্ ধাতু তোমরা সকলেই দেখিয়াছ, আজকাল এক-আনি, দোয়ানি ও চারি-আনি নিকেল দিয়া তৈয়ারি করা হইতেছে। একটা আনির কাছে চুম্বক রাখিয়া পরীক্ষা করিয়ো ; দেখিবে, তাহা চুম্বকের কাছে আসিতেছে। কিন্তু সোনা, রূপা, তামা বা দস্তার জিনিষকে টানিয়া চুম্বক কখনই কাছে আনে না।



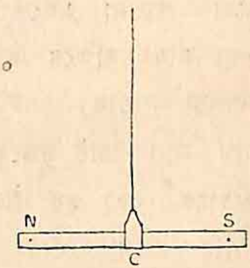
কৃত্রিম চুম্বক ও লোহার গুঁড়া

এখানে একটা ছবি দিলাম। লোহার গুঁড়ার মধ্যে একটা লম্বা চুম্বককে ডুবাইয়া রাখায়, তাহার

দুই পাশে কি-রকমে লোহার গুঁড়া লাগিয়া গিয়াছে, ছবিতে তাহা দেখা যাইতেছে। কিন্তু দেখ, চুম্বকের মাঝখানটায় গুঁড়া লাগিয়া নাই। ইহা দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, চুম্বকের লোহা টানার শক্তি বেশি থাকে তাহার দুই প্রান্তে। তার পরে সেই শক্তি কমিতে কমিতে মাঝে একেবারে লোপ পায়। ঘোড়ার নালের মতো বাঁকানো চুম্বক লইয়া পরীক্ষা করিলেও তোমরা ঠিক উহাই দেখিতে পাইবে। এই চুম্বকেরও মাঝ-খান্‌টা একটুও লোহার গুঁড়া আকর্ষণ করিবে না। চুম্বকের যে দুই প্রান্তে আকর্ষণের জোর বেশি, তাহাদের বলা হয় মেরু (Poles)। চুম্বক মাত্রেরই দুইটা করিয়া মেরু থাকে। যাহার কেবল একটা মেরু আছে, তোমরা এ-রকম চুম্বক খুঁজিয়া পাইবে না।

পর-পৃষ্ঠায় একটা ছবি দিলাম। ছবিটি কিসের, তাহা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। একটা লম্বা চুম্বকের মাঝে সূতা বাঁধিয়া ঝুলাইলে তাহাকে যে-রকমটি দেখায় ছবিতে তাহাই আঁকিয়া দিয়াছি। তোমরা যদি কোনো চুম্বককে এই-রকমে সূতা বাঁধিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখো, তবে দেখিবে, একটু ঘুরপাক

খাইয়া সেটি তাহার এক প্রান্ত উত্তরে এবং আর এক প্রান্ত দক্ষিণে রাখিয়া স্থির থাকিবে। তাহাকে কখনই পূর্ব্ব-পশ্চিম বা অন্য কোনো দিকে লম্বা হইয়া থাকিতে দেখিবে না। অর্থাৎ সম্পূর্ণ খেলিয়া বেড়াইতে পারে, এই রকম ভাবে রাখিলে চুম্বকের একটা মেরু থাকে উত্তরে এবং অন্যটা থাকে দক্ষিণে। ইহা চুম্বক মাত্রেরই আর একটা বিশেষ গুণ।



সূতায় ঝুলানো চুম্বক

এখন আগেকার পরীক্ষায় চুম্বকের যে-প্রান্তটা উত্তরে গেল, তাহার গায়ে N এবং যাহা দক্ষিণে আছে তাহার গায়ে S অক্ষর কালি দিয়া লিখিয়া রাখো। তার পরে যে-প্রান্তটা উত্তরে ছিল তাহাকে দক্ষিণে এবং যাহা দক্ষিণে ছিল, তাহাকে ঠেলিয়া উত্তরে আনিয়া ছাড়িয়া দাও। দেখিবে, সূতায়-বাঁধা চুম্বক দোল খাইয়া তাহার সেই N-চিহ্নিত প্রান্তকে আবার উত্তরে এবং S-চিহ্নিত প্রান্তকে আবার দক্ষিণে আনিয়াছে। তাহা হইলে দেখা গেল, চুম্বক কেবল উত্তর-দক্ষিণে লম্বা হইয়া থাকে না। উহার যে-প্রান্তটা প্রথমে

উত্তরে ছিল, তাহাকে ঘুরাইয়া অন্য দিকে আনিলে তাহা আপনা হইতে ঘুরিয়া সেই উত্তরেই আসে এবং যাহা দক্ষিণে ছিল তাহা ফিরিয়া ঘুরিয়া দক্ষিণে আসিয়া দাঁড়ায়। এই নিয়মের কখনই নড়চড় দেখা যায় না। তাই চুম্বকের যে-মেরু উত্তরে গিয়া দাঁড়ায়, তাহাকে বলা হয় উত্তর-মেরু (North Seeking Pole) এবং যাহা দক্ষিণে যায়, তাহার নাম দেওয়া হয় দক্ষিণ-মেরু (South Seeking Pole)। প্রত্যেক চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু ধরা-বাঁধা থাকে,—তাহার কোনো পরিবর্ত্তন হয় না। যে-রকমেই ঝুলাইয়া রাখো না কেন, তাহার উত্তর-মেরু ঘুরিয়া ফিরিয়া উত্তরে যাইবে, এবং দক্ষিণ-মেরু দক্ষিণে যাইবে।

চুম্বক-মাত্রেই মুক্ত-অবস্থায় যে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা হইয়া থাকে, আর এক রকমে পরীক্ষা করিলে তোমরা তাহা সহজে দেখিতে পাইবে। ছবিতে দেখ, একটা কর্ক জলে ভাসিতেছে এবং তাহার উপরে এক-খানি লম্বা চুম্বক রাখা হইয়াছে। এই অবস্থায় থাকিয়া চুম্বক ও কর্ক

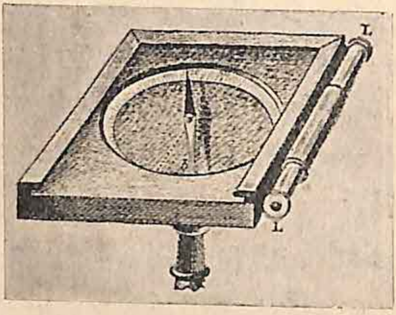


কর্কের উপরে চুম্বক

কিছুক্ষণ ঘুরপাক্ খাইবে। কিন্তু যখন স্থির হইয়া দাঁড়াইবে, তখন দেখা যাইবে চুম্বক ঠিক্ উত্তর-দক্ষিণে লম্বা হইয়া রহিয়াছে।

চুম্বকের এই গুণটি লইয়া কম্পাস্ (Compass) অর্থাৎ দিগ্‌দর্শন যন্ত্র তৈয়ারী করা হয়। ইহা দিয়া কোন্‌টা উত্তর এবং দক্ষিণ দিক্ ঠিক্ করা যায়। অকূল সমুদ্রে এবং অন্ধকার রাত্রিতে কোন্‌টা কোন্ দিক্ ঠিক্ করা যায় না। তখন জাহাজের মাল্লারা কম্পাসের সাহায্যে দিক্ ঠিক্ করিয়া জাহাজ চালায়। তোমরা কম্পাস দেখ নাই কি? ঘড়ির চেনের সঙ্গে অনেকে খুব ছোটো কৌটার মতো কম্পাস্ লাগাইয়া রাখেন। কম্পাস্ জিনিষটা যে কি, এখন তোমরা বুঝিতে পারিবে। পর পৃষ্ঠায় একটা কম্পাসের বড় ছবি আঁকিয়া দিলাম। ছবিতে যে কাঁটা দেখা যাইতেছে তাহা পাত্‌লা ইস্পাতের চুম্বক। এই কাঁটার ঠিক্ মাঝে ছোট পেয়ালার মতো একটা অংশ জোড়া আছে। তার পরে সেই কাঁটার গায়ের পেয়ালাটিকে উপুড় করিয়া একটা শিকের উপরে লাগাইলেই কম্পাস্ তৈয়ারি হইয়া যায়। এই অবস্থায় কাঁটা শিকের উপরে দাঁড়াইয়া সহজে খেলিয়া বেড়াইতে পারে। তাই উহা ঘুরিয়া ফিরিয়া

উত্তর-মেরুকে উত্তর দিকে এবং দক্ষিণ-মেরু দক্ষিণে রাখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং, কাঁটা দেখিবামাত্র কোন্‌টা উত্তর এবং কোন্‌টাই বা দক্ষিণ দিক্ ঠিক্ করা যায়। নীচের ছবিতে কাঁটার যে-অংশটাকে খুব কালো করিয়া আঁকা আছে, তাহা উহার উত্তর-মেরু। মনে কর,

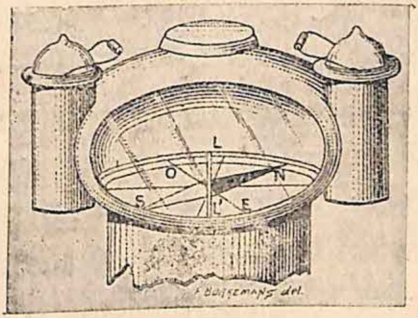


কম্পাস্

তোমরা কয়েকজন দূরের গ্রামে বেড়াইতে গিয়া সন্ধ্যার সময়ে বাড়ী ফিরিতেছ। পথে সন্ধ্যা হইয়া গেল,—এমন অন্ধকার যে, দূরের গাছপালা ও গ্রাম নজরে পড়িতেছে না। এমন অবস্থায় তোমাদের কাহারো পকেটে যদি একটা কম্পাস্ থাকে, তাহা হইলে বাড়ী ফেরার সুবিধা হয় না কি? কম্পাসের কাঁটা উত্তর-দক্ষিণে লম্বা হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং এই কাঁটা দেখিয়া তোমরা বাড়ী ফিরিতে পারিবে। তাই বড় মাঠের মধ্য দিয়া অন্ধকারে চলিবার সময়ে কাছে কম্পাস্ থাকিলে পথ ভোলার সম্ভাবনা থাকে না।

পূর্ব্ব পৃষ্ঠার ছবিতে দেখ, যে-কৌটায় কম্পাসের কাঁটা আছে, তাহার গায়ে অনেক দাগ কাটা রহিয়াছে। এই সব দাগের গায়ের লেখা পড়িয়া কোন্‌টা পূর্ব্ব, কোন্‌টা পশ্চিম, কোন্‌টা উত্তর-পূর্ব্ব, কোন্‌টা দক্ষিণ-পশ্চিম ইত্যাদি সকল দিক্‌ই জানা যায়।

এখানে আর একটা কম্পাসের ছবি দিলাম। ইহা জাহাজের কম্পাস্। জাহাজ সর্ব্বদাই হেলিয়া দুলিয়া চলে। কেবল ইহাই নয়, বেশি ঢেউ হইলে জাহাজ উপরে উঠিয়া পরক্ষণে ঝপাৎ করিয়া নীচে নামে। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের উপরকার সব জিনিষই হেলিতে দুলিতে থাকে।



জাহাজের কম্পাস্

কিন্তু কম্পাসের কাঁটাকে স্থির না রাখিলে তাহা উত্তর-দক্ষিণে দাঁড়ায় না। তাই জাহাজের হেলা-দোলার সঙ্গে যাহাতে কাঁটা চঞ্চল না হয় তাহার ব্যবস্থা এই সব কম্পাসের থাকে। ব্যবস্থাটা বিশেষ কিছুই নয়।

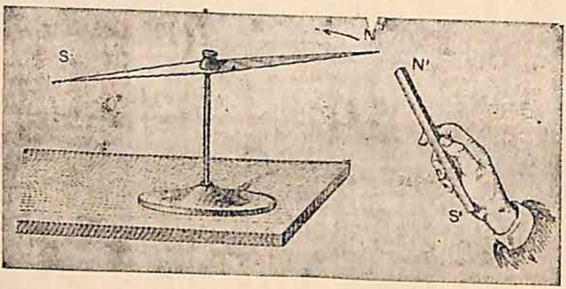
ব্রাকেটের গায়েই হউক, বা থামের গায়ে হউক, দুইটা শলা লাগাইয়া কম্পাসের কৌটাকে ঝুলাইয়া রাখা হয়। কাজেই, জাহাজের সঙ্গে ব্রাকেট্ বা থাম দুলিলে কৌটা দুলিতে পায় না।

যাহা হউক, জাহাজের কম্পাস্‌গুলিকে খুব সাবধানে তৈয়ার করা সত্ত্বেও, তাহার দোলন একেবারে বন্ধ করা যায় না। বড় বড় ঝড়ে যখন জাহাজ বেশী কাৎ হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে কম্পাসেরও কাৎ হইতে দেখা যায়। বিশেষতঃ, যুদ্ধের জাহাজে এ-রকম কম্পাসে কোনো কাজই চলে না। এই-সব জাহাজ হইতে যখন কামান ছোড়া হয়, তখন সেগুলি এত দুলিতে আরম্ভ করে যে, কম্পাস্‌কে কোনো ক্রমে ঠিক রাখা যায় না। তাই যুদ্ধের জাহাজের কম্পাস্‌কে আর এক রকমে স্থির রাখিতে হয়। মনে কর, কোনো পাত্রের জলের ভিতরে একটা জিনিষ ডুবিয়া আছে। জিনিষটি জলের তলায় পড়ে নাই বা উপরে উঠে নাই—তাহা জলের ভিতরে ডুবিয়া যেন ভাসিতেছে। এই অবস্থায় পাত্রটিকে নাড়াইলে কি হয় বলা যায় না কি? পাত্র নড়ে এবং তাহার আশ-পাশের জলও একটু নড়াচড়া করে, কিন্তু মাঝের জল এবং সেখানকার ভাসমান জিনিষটা একটুও

নড়ে না। আজকাল যুদ্ধের জাহাজে যে-সব কম্পাস্ ব্যবহার করা হয়, সেগুলিতে কোনো রকম ফাত্না বাঁধিয়া অ্যালকোহল-মিশ্রিত জলে ফেলিয়া রাখা হয়। কম্পাস্ নিজের ভারে জলের তলায় নামিতে চায়। ফাত্না তাহাকে ঠেলিয়া জলের মাঝে ভাসাইয়া রাখে। তাই কামান চালাইলে যখন জাহাজ খুব দুলিতে আরম্ভ করে, তখন অ্যাল্‌কোহল-মিশানো জলের ভিতরকার কম্পাস্ স্থির থাকিয়া যায়।

চুম্বকে চুম্বকে আকর্ষণ-বিকর্ষণ

নীচের ছবিখানি দেখ। ইহা এক রকম কম্পাসেরই ছবি। ধাতুর শিকের উপরে একটি চুম্বকের কাঁটা বসানো আছে। তাই ইহা চর্‌কি কলের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে। তোমরা আগেই দেখিয়াছ, এই অবস্থায় চুম্বকের কাঁটা উত্তর-দক্ষিণে লম্বা হইয়া দাঁড়ায়।



কম্পাসে চুম্বকের টান

ছবিতে তাহাই আঁকা আছে। ইহার N-চিহ্নিত উত্তর-মেরু আছে উত্তর দিকে এবং S-চিহ্নিত দক্ষিণ মেরু আছে দক্ষিণে। এমন সময়ে তোমরা যদি আর একটা চুম্বককে কম্পাসের কাঁটার কাছে আনিতে পারো

তাহা হইলে একটা মজার ব্যাপার দেখিতে পাইবে। ছবিতে দেখ, কম্পাসের উত্তর-মেরুর কাছে অন্য আর একটা চুম্বকের উত্তর-মেরু আনা হইয়াছে। এই অবস্থায় কাঁটা কখনই স্থির থাকিবে না,—তাহার উত্তর-মেরু চুম্বকের উত্তর–মেরুর কাছ হইতে ছিট্‌কাইয়া দূরে যাইবে। তাহা হইলে বলিতে হয়, কাঁটার উত্তর-মেরুর সঙ্গে চুম্বকের উত্তর-মেরুর বিকর্ষণ (Repulsion) হয়। এখন ঐ কাঁটার উত্তর-মেরুর কাছে, তোমার হাতের চুম্বকের দক্ষিণ-মেরু আনো। আগে যাহা দেখিয়াছিলে, এখন তাহারি ঠিক্ উল্টা ব্যাপার দেখা যাইবে। অর্থাৎ কাঁটার উত্তর-মেরুকে হাতের চুম্বকটির দক্ষিণ-মেরু জোরে আকর্ষণ করিবে। তাহা হইলে দেখা গেল, দুই চুম্বকের একের উত্তর-মেরুর সঙ্গে অপরের উত্তর-মেরুর বিকর্ষণ হয় এবং উত্তর-মেরুতে ও দক্ষিণ-মেরুতে আকর্ষণ দেখা যায়।

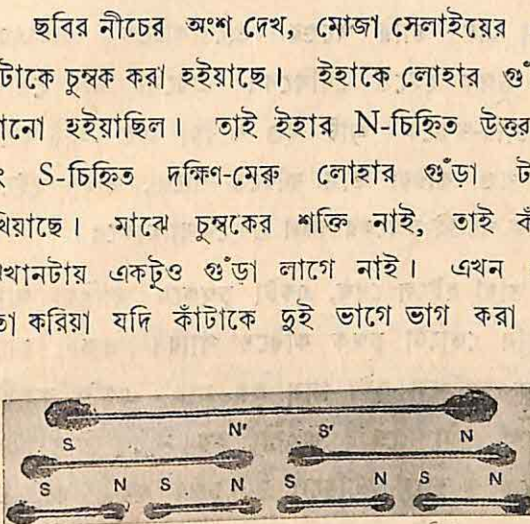
এখন তোমরা যদি হাতের চুম্বকের দক্ষিণ-মেরুকে কাঁটার দক্ষিণ–মেরুর কাছে আনিয়া পরীক্ষা কর তাহা হইলেও আগেকার মতো বিকর্ষণ দেখিতে পাইবে এবং তার পরে চুম্বকের উত্তর-মেরুকে যেই কাঁটার দক্ষিণ-মেরুর কাছে আনিবে, অমনি তাহাদের মধ্যে আকর্ষণ

দেখা দিবে। অর্থাৎ, আগে যেমন উত্তরে-উত্তরে বিকর্ষণ দেখা গিয়াছিল এখানে সেই রকমে দক্ষিণে-দক্ষিণে বিকর্ষণ হইল এবং তার পরে আগেকার মতোই উত্তর-দক্ষিণে আকর্ষণ দেখা গেল।

এই আকর্ষণ-বিকর্ষণ লইয়া আজকাল অনেক কল তৈয়ারি করা হইতেছে। সুতরাং ইহা মনে রাখা প্রয়োজন। দুইটা চুম্বকের একই রকম মেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে, এই কথাটা তোমরা মনে রাখিয়ো।

চুম্বকের আর একটি গুণ

ছবির নীচের অংশ দেখ, মোজা সেলাইয়ের একটা কাঁটাকে চুম্বক করা হইয়াছে। ইহাকে লোহার গুঁড়াতে ডুবানো হইয়াছিল। তাই ইহার N-চিহ্নিত উত্তর-মেরু এবং S-চিহ্নিত দক্ষিণ-মেরু লোহার গুঁড়া টানিয়া রাখিয়াছে। মাঝে চুম্বকের শক্তি নাই, তাই কাঁটার মাঝখানটায় একটুও গুঁড়া লাগে নাই। এখন ছবির মতো করিয়া যদি কাঁটাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়,



তাহা হইলে কি হয় বলিতে পারো কি? তোমরা হয় ত বলিবে ডাইনের খণ্ডে উত্তর-মেরু এবং বামের খণ্ডে দক্ষিণ-মেরু থাকিবে। কিন্তু তাহা নয়, চুম্বকটিকে দুই খণ্ডে ভাঙিয়া ফেলায় প্রত্যেক খণ্ড এক একটা পৃথক্ চুম্বক হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং প্রত্যেকের দুই প্রান্তে উত্তর-মেরু ও দক্ষিণ-মেরু দেখা যাইতেছে। এখন আবার এই দুই

খণ্ডের প্রত্যেকটিকে ভাঙিয়া আরো ছোটো-ছোটো দুই-দুই খণ্ডে ভাগ কর। তাহা হইলে এখন সেই কাঁটাটা চারি খণ্ডে ভাগ হইয়া গেল। পরীক্ষা করিলে তোমরা এই চারি খণ্ডের প্রত্যেকটিকে এক-একটি পৃথক্ চুম্বক হইতে দেখিবে। এখনো যদি তোমরা এই চারি-খণ্ডকে আট খণ্ড করিয়া এবং আট-খণ্ডকে ষোল খণ্ড করিয়া ভাগ করিতে পারো, তাহা হইলেও প্রত্যেক খণ্ডেই চুম্বকের সকল গুণ দেখা যাইবে।

তাহা হইলে দেখ, একটা চুম্বককে ভাঙিয়া আমরা যত-খুসি ছোটো চুম্বক করিতে পারি। একটা কাচের গ্লাস্‌কে ভাঙিলে দুটা গ্লাস্ হয় না। একটা কলসীকে ভাঙিলে দুটা ছোট কলসী হয় না। কিন্তু একটা চুম্বককে দু-ভাগে ভাঙিলে দুটা চুম্বক হয়। দশ ভাগে ভাঙিলে দশটা চুম্বক হয়; হাজার ভাগে ভাঙিলে হাজারটা চুম্বক হয়। আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় কি? তোমরা রক্তবীজের গল্প বোধ করি শুনিয়াছ। রক্তবীজ নামে এক ভয়ঙ্কর অসুর ছিল। তাহার গায়ের রক্ত মাটিতে পড়িলেই রক্তের প্রত্যেক ফোঁটা হইতে এক-একটা প্রকাণ্ড অসুর গজাইয়া উঠিত। কেবল ইহাই নয়, সেই অসুরগুলা জন্মিয়াই লড়াইয়ে লাগিয়া যাইত।

এই জন্য কোনো দেবতাই রক্তবীজের সঙ্গে যুদ্ধে জিতিতে পারিতেন না। এমন কি, দূর হইতে তাহার গায়ে তীর মারিলেও ভয় হইত,—পাছে রক্ত মাটিতে পড়িয়া একটা রক্তবীজের জায়গায় দশটা রক্তবীজ জন্মায়। চুম্বকগুলা যেন রক্তবীজের ঝাড়। এগুলিকে যত কুচি-কুচি কর না কেন, প্রত্যেক কুচিই এক-একটা নূতন চুম্বক হইয়া দাঁড়ায়। হামান-দিস্তা দিয়া গুঁড়া কর, তাহার প্রত্যেক কণাতে চুম্বকের সব গুণই দেখিতে পাইবে।

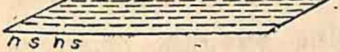
তোমরা বোধ করি এখন জিজ্ঞাসা করিবে, কেন এমনটি হয়? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। আমাদের চারিদিকে সর্ব্বদাই এমন অনেক ব্যাপার ঘটে, যাহার কারণ দেখাইতে গিয়া পণ্ডিতদের হার মানিতে হয়। গাছে আম পাকিলে হঠাৎ একদিন তাহা টুপ্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। কেন পড়ে, এই প্রশ্ন করিলে খুব বড় বড় পণ্ডিতদের কাছেও জবাব পাওয়া যায় না। কত জোরে পড়ে, কতক্ষণ ধরিয়া পড়ে,—এসব হিসাব করা চলে মাত্র। চুম্বকের বিষয়টা এই রকমেরই একটা রহস্যময় ব্যাপার। চুম্বকের চুম্বকত্ব কোথা হইতে আসে, ঠিক্ জানা নাই। তবে

কতকগুলি বৈজ্ঞানিক যাহা অনুমান করেন, তাহাই তোমাদিগকে বলিব।

তোমরা বোধ হয় জানো, এই পৃথিবীর সমস্ত জিনিষই অণু (Molecules) দিয়া গঠিত। এই পাত্রে যে-জল রহিয়াছে, তাহাতে অসংখ্য জলের অণু আছে। এইগুলি কাছাকাছি থাকিয়া জলের রূপ পাইয়াছে। সেই রকমে লোহা-তামা সোনা-রূপা, ইট্-কাঠ প্রভৃতি প্রত্যেক জিনিষই তাহার অণুর যোগে উৎপন্ন। অণুগুলিকে চোখে দেখা যায় না, এমন কি অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও নজরে পড়ে না। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, লোহা প্রভৃতি যে-সব জিনিষকে চুম্বক করা যায়, তাহাদের প্রত্যেক অণুই এক-একটি অতি-সূক্ষ্ম চুম্বক। চুম্বক মাত্রেরই উত্তর-মেরু ও দক্ষিণ-মেরু থাকে। তাই ঐ-সব জিনিষের প্রত্যেক অণুর একটা দিকে উত্তর-মেরু ও অপর দিকে দক্ষিণ-মেরু আছে। সাধারণ অবস্থায় লোহা প্রভৃতি চৌম্বক জিনিষের অণুগুলি ভয়ানক এলোমেলোভাবে সাজানো থাকে। তাই প্রায়ই একের উত্তর-মেরু অন্যের দক্ষিণ-মেরুর সঙ্গে মিলিয়া পরস্পরের শক্তি লোপ করে। এজন্য বাহির হইতে তাহাদের চুম্বকত্বের কোনো লক্ষণই দেখা যায়

না। কিন্তু সেই লোহাকেই যখন চুম্বক করা যায়, তখন তাহার প্রত্যেক অণুর দক্ষিণ-মেরু এক দিকে এবং উত্তর-মেরু অন্য দিকে ঘুরিয়া দাঁড়ায়। ইহাতে তাহার এক প্রান্তে উত্তর-মেরু এবং অন্য প্রান্তে দক্ষিণ-মেরু হইয়া পড়ে।

অণু-সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, বোধ করি তোমরা তাহা বুঝিতে পারো নাই। এখানে যে-ছবিটি দিলাম তাহা দেখিলে বিষয়টি বুঝিবে। মনে করা যাউক, ছবিতে যে-লম্বা দাগগুলি রহিয়াছে সেগুলি যেন এক-একটা লৌহ-ফলকের অণু। এই সকল অণুর প্রত্যেকটিই এক-একটি চুম্বক। চুম্বকের মতোই ইহাদের উত্তর-মেরু ও দক্ষিণ-মেরু আছে। আগে এগুলি এলোমেলো-ভাবে সাজানো ছিল, তাই বাহির হইতে তাহাদের চুম্বক-শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত না।



চুম্বকের অণু

লৌহ-ফলকটিকে চুম্বক করার পরে, সেই অণু-গুলিই কি-রকম নিয়মিতভাবে দাঁড়াইয়াছে ছবিটি দেখিলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে। দেখ, ইহার সকল অণুরই উত্তর-মেরু ডাইন দিকে এবং দক্ষিণ-মেরু

বাম দিকে রহিয়াছে। ইহার ফল কি হয়, বলা যায় না কি? মাঝের প্রত্যেক অণুর শক্তি তাহার পাশের অণুর শক্তির সহিত কাটাকুটি হইয়া যায়, কেবল বাম প্রান্তের অণুগুলির উত্তর-মেরু এবং ডাইনের অণুগুলির দক্ষিণ-মেরু মুক্ত থাকে। কাজেই, সমস্ত লোহার ফলকটির বামে উত্তর-মেরু ও ডাইনে দক্ষিণ-মেরু দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এক দল ইহাকেই লোহা প্রভৃতি ধাতুর চুম্বক হওয়ার কারণ বলিয়া থাকেন। চুম্বকের মাঝামাঝি জায়গায় কেন চুম্বক-শক্তি থাকে না, তাহারো ব্যাখ্যান ইহা হইতে পাওয়া যায়। ছবিতে দেখ, মাঝের অণুগুলির একের উত্তর-মেরু, অপরের দক্ষিণ-মেরুর গা-ঘেঁসিয়া রহিয়াছে। ইহাতে অণুগুলির চুম্বক শক্তি পরস্পর কাটাকুটি হইয়া যাইতেছে। কাজেই, সেখানে একটুও চুম্বক-শক্তি থাকে না। ডাইন এবং বাম প্রান্তের অণুগুলির চুম্বক-শক্তি সে-প্রকারে নষ্ট হইতেছে না। ইহারি ফলে ফলকের দুই প্রান্তে চুম্বক-শক্তি দেখা যায়।

এক টুক্‌রা চুম্বককে ভাঙিয়া দুই টুক্‌রা করিলে প্রত্যেক টুক্‌রা কেন চুম্বক হইয়া দাঁড়ায়, তোমরা তাহা এখন বুঝিতে পারিবে। মাঝের অণুগুলির একের

উত্তর-মেরু অন্যের দক্ষিণ-মেরুর সহিত মিলিয়া বেশ সাম্য অবস্থায় ছিল। যখন চুম্বকটিকে ভাঙা যায়, তখন ভাঙনের গায়ের অণুগুলি মুক্ত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় তাহাদের মেরুর শক্তিকে নষ্ট করার আর কিছুই থাকে না। কাজেই, তখন প্রত্যেক টুক্‌রার ভাঙনের গায়ে উত্তর-মেরু ও দক্ষিণ-মেরু দেখা যায়।

চুম্বকের শক্তি যে, তাহার অণুর ভিতরেই থাকে, আরো অনেক পরীক্ষার দ্বারা তাহা জানা যাইতে পারে। খানিকটা লোহার গুঁড়াকে একটা কাচের নলের মধ্যে পুরিয়া কোনো বড় চুম্বকের কাছে রাখো। ইহাতে গুঁড়ার এক প্রান্তে উত্তর-মেরু এবং অপর প্রান্তে দক্ষিণ-মেরুর লক্ষণ দেখা যাইবে। অর্থাৎ তখন সমস্ত গুঁড়া যেন একখানি চুম্বক হইয়া দাঁড়ায়। এখন সেই বড় চুম্বকখানিকে দূরে সরাইয়া ফেলো। দেখিবে, ইহাতে নলের ভিতরকার গুঁড়ার চুম্বকত্ব লোপ পাইবে না। কেন এ-রকম হয় বলা কঠিন নয়। বাহিরের চুম্বকের টানে লোহার গুঁড়ার প্রত্যেক কণা এক দিকে উত্তর-মেরু এবং অন্য দিকে দক্ষিণ-মেরু রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাই সমস্ত গুঁড়াও একখানি চুম্বক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখন নলের গুঁড়াকে

ঝাঁকাইয়া এলোমেলো করিয়া দাও—দেখিবে, গুঁড়াতে আর চুম্বক-শক্তি থাকিবে না।

স্পিরিট্ ল্যাম্পের উপরে ধরিয়া খুব গরম করিলে চুম্বকের শক্তি নষ্ট হয়। আবার সেই চুম্বকটিই যখন ঠাণ্ডা হয়, তখন তাহা চুম্বক-শক্তি ফিরিয়া পায়। তোমরা এই সহজ পরীক্ষাটি নিজে হাতে করিয়া দেখিয়ো। চুম্বকের শক্তি যে তাহার অণুতে থাকে, তাহা এই পরীক্ষায় বুঝা যায় না কি? কোনো জিনিষকে গরম করিলেই তাহার অণুগুলির গতি বাড়িয়া যায়,—তখন সেগুলি ভিতরে ভিতরে এলোমেলো-ভাবে ছুটাছুটি করে। কাজেই, ঠাণ্ডা অবস্থায় অণুগুলি যে-ভাবে দাঁড়াইয়া চুম্বকের এক প্রান্তকে উত্তর-মেরু এবং অন্য প্রান্তকে দক্ষিণ-মেরু করিয়াছিল গরম অবস্থায় তাহা করিতে পারে না। ইহাতেই গরম চুম্বক তাহার শক্তি হারায়। তার পরে ঠাণ্ডা হইলে চুম্বকের এলোমেলো অণুগুলি যেমনি আগের অবস্থায় ফিরিয়া আসে, অমনি তাহাতে আগের মতো চুম্বক-শক্তি দেখা দেয়।

তোমরা সার জে, জে, টম্‌সনের নাম বোধ করি শুন নাই। তিনি এখন পৃথিবীর মধ্যে একজন বড়

বৈজ্ঞানিক। পরমাণুর ভিতরকার অতি-সূক্ষ্ম বিদ্যুতের কণা (Electron) যে, নানাপ্রকারে ঘুরিয়া চুম্বক-শক্তির সৃষ্টি করে, তাহা তিনি প্রমাণ করিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে তোমাদিগকে এখন কিছু বলিব না, পরে জানিতে পারিবে। সুতরাং টম্‌সন্ সাহেবের মতেও বলা যায়, পদার্থের অণু-পরমাণুতেই চুম্বক-শক্তি থাকে।

চুম্বক-শক্তির আবেশ

মানুষ সহজ অবস্থায় আছে, বেশ হাসিয়া-খেলিয়া বেড়াইতেছে। হঠাৎ কখনো কখনো তাহার ঘাড়ে ভূত চাপে। তোমরা এ-রকম ভূতে-পাওয়া লোক দেখ নাই কি? ভূত চাপিলে আর রক্ষা থাকে না। তখন সে আবোল-তাবোল বকিতে থাকে। ভূত নাকি সেই লোকটারই মুখ দিয়া কখনো কখনো নিজের কথা বলিতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ মানুষটার ব্যবহার আগে ভূতের মতো ছিল না, এখন সে ভূতের মতো আচরণ করে। লোহা প্রভৃতি যে-সব ধাতুকে চুম্বকে পরিণত করা যাইতে পারে, তাহাতে অবস্থা-বিশেষে চুম্বক-শক্তির আবেশ (Induction) হয়। সাধারণ লোহাতে চুম্বক-শক্তি থাকে কি? কখনই থাকে না। চুম্বক-শক্তি আনিতে হইলে ইস্পাত-লোহাকে হাফরে ফেলিয়া পান্ দিয়া শক্ত করিতে হয়। তার পরে চুম্বক ঘষিয়া বা বিদ্যুৎ চালাইয়া অনেক হাঙ্গামা করিলে তাহাতে স্থায়ী চুম্বক-শক্তি আসে। কিন্তু মানুষের ঘাড়ে ভূত চাপিলে সহজ মানুষ যেমন ভূতের মতো

আচরণ করে, তেমনি সাধারণ লোহার কাছে বা গায়ে চুম্বক রাখিলে তাহাও অস্থায়িভাবে চুম্বকের কাজ দেখায়। তোমরা ইহা দেখ নাই কি?

এখানে একটা ছবি দিলাম। দেখ, ছবির দুই পাশে দুইটা বড় চুম্বক রহিয়াছে। "N" তাহাদের উত্তর-মেরু



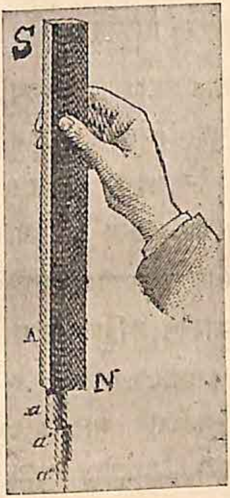
এবং "S" দক্ষিণ-মেরু। তার পরে চুম্বক দুইটির মাঝে এক টুক্‌রা সাধারণ লোহা রাখা হইয়াছে। এই রকমে তোমরা যদি পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, টুকরাটি আপনা হইতেই চুম্বক হইয়া গিয়াছে। এই

অবস্থায় "N^1" হয় তাহার উত্তর-মেরু এবং "S^1" দক্ষিণ-মেরু। দুই চুম্বকের উপরে লোহার গুঁড়া ছড়াইয়া দাও। দেখিবে, উহাদের প্রত্যেক মেরুতে গুঁড়া আট্‌কাইয়া যাইতেছে।

তাহা হইলে দেখা গেল, যে-লোহায় চুম্বক শক্তি ছিল না, চুম্বকের কাছে রাখায় তাহাতে সেই শক্তির আবেশ হইল। আশ্চর্য্য ব্যাপার। এখন "N S" চিহ্নিত আসল চুম্বক দুইটিকে দূরে সরাইয়া ফেল। এই অবস্থায় "N^1 S^1" লোহার টুকরায় একটুও চুম্বক-শক্তি থাকিবে না,—তখন তাহার গায়ের লোহার গুঁড়া আপনা হইতেই খসিয়া পড়িবে। তাহা হইলে বলিতে হয়, চুম্বকের কাছে থাকায় সাধারণ লোহাতে যে চুম্বক-শক্তি হয়, তাহা স্থায়ী নয়। যতক্ষণ সেটি চুম্বকের কাছে থাকে, ততক্ষণই তাহাতে চুম্বক-শক্তির চিহ্ন দেখা যায়। চুম্বকের কাছ হইতে সরাইলে সেই শক্তি লোপ পায়।

পরপৃষ্ঠায় আর একটা ছবি দিলাম। ইহার S N-চিহ্নিত অংশ একটি বড় চুম্বক। ইহার উত্তর-মেরু যেন নীচের দিকে আছে। a', a'', a''' অংশগুলি সাধারণ লোহার টুকরা। চুম্বকের উত্তর-মেরুতে a' চিহ্নিত লোহার টুকরা লাগিবা মাত্র তাহাতে চুম্বকত্বের

আবেশ হয়। তাহার দক্ষিণ-মেরু বড় চুম্বকের দিকে এবং উত্তর-মেরু নীচের দিকে থাকে। কাজেই, টুকরাটি খসিয়া পড়ে না। এখন যদি a'' ফলকটিকে a' ফলকের নীচে লাগানো যায়, তাহা হইলে ইহাও চুম্বক হইয়া প্রথম ফলকের নীচে ঝুলিতে থাকে। এই দ্বিতীয় ফলকের উপরকার প্রান্তে দক্ষিণ-মেরুর এবং নীচের প্রান্তে উত্তর-মেরুর আবেশ হয়। উত্তর, দক্ষিণকে আকর্ষণ করে। ইহার জন্য দ্বিতীয় ফলকটিও খসিয়া পড়ে না। এই রকমে বড় চুম্বকের গায়ে চারি-পাঁচটি লোহার টুকরা মালার মতো ঝুলাইয়া রাখা যায়। কিন্তু যেই প্রথম ফলকটিকে চুম্বক হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়, অমনি সব ফলকই খসিয়া পড়ে। কেন ইহা ঘটে বলা কঠিন নয়। ফলকগুলি সাধারণ লোহা দিয়া তৈয়ারি। তাই সেগুলিতে যে চুম্বক শক্তির আবেশ হয়, তাহা স্থায়ী হইতে পায় না। এই জন্যই



মূল চুম্বককে সরাইয়া লইলেই প্রথম ফলকে চুম্বকত্ব থাকে না। ইহাতে ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি সকল ফলকই চুম্বকত্ব হারাইয়া ফেলে। তোমরা একটা চুম্বক ও কয়েকটি লোহার পেরেক লইয়া এই পরীক্ষা করিয়ো। দেখিবে, চুম্বকের যে-কোনো মেরুতে পেরেকগুলিকে মালার মতো করিয়া ঝুলানো যাইবে।

কোনো চুম্বককে লোহার গুঁড়ার মধ্যে ডুবাইলে তাহার মেরুতে গুঁড়া গুচ্ছাকারে লাগিয়া থাকে। কেন ইহা হয়, এখন তোমরা হয় ত নিজেরাই বলিতে পারিবে। গুঁড়ার প্রত্যেক কণা চুম্বকের গায়ে লাগিয়া এক-একটি ছোট চুম্বক হইয়া দাঁড়ায়। তার পরে সেই সকল কণা অন্য কণাতে চুম্বকের আবেশ করিয়া কাছে আনে। এই রকমে এক কণা অন্য কণাকে পরে পরে চুম্বক করিয়া ফেলে! কাজেই, সেগুলি আগেকার উদাহরণের লোহার ফলকের মতো গায়ে গায়ে লাগিয়া গুচ্ছাকার পায়।

সাধারণ লোহাতে যে চুম্বক-শক্তির আবেশ হয়, তাহা কেন স্থায়ী হয় না, এখন সেই কথাটি তোমাদিগকে বলিব। তোমরা বোধ হয় জানো না, আমরা যে-সব লোহা দেখিতে পাই, সেগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ

করা যায়। পেটাই লোহা তোমরা বোধ করি দেখিয়াছ। এই লোহা দিয়া কামারে হাতা-বেড়ি ইত্যাদি জিনিষ তৈয়ারি করে। ইহা নরম, হাতুড়ির ঘা দিলে ইহাতে দাগ হয় এবং যথেষ্ট জোর দিলে ইহাকে ধনুকাকারে বাঁকানোও চলে। আর এক রকম লোহা আছে, তাহাকে বলে ঢালাই লোহা। ইহা অত্যন্ত দৃঢ় এবং হাতুড়ির ঘা মারিলে ফাটিয়া যায়। বিলাত হইতে যে মাল-পত্র তৈয়ারি হইয়া আসে, তাহার অধিকাংশই ঢালাই লোহায় প্রস্তুত। গরম করিলে ইহা সহজে গলিয়া যায়। তাই গালানো ঢালাই লোহাকে ছাঁচে ফেলিয়া অনেক জিনিষ তৈয়ারি করা যায়। তৃতীয় লোহার নাম ইস্পাত। ইহার প্রধান গুণ, কঠিনতা এবং স্থিতিস্থাপকতা। তাই ইস্পাত দিয়া অস্ত্র-শস্ত্র এবং ঘড়ির স্প্রিং তৈয়ারি করা হয়। কিন্তু মনে রাখিয়ো, এই তিন রকম লোহায় কোনোটিই বিশুদ্ধ লোহা নয়। কয়লা প্রভৃতি কয়েকটা জিনিষ মিশাইয়া এই তিন রকম লোহা তৈয়ারি করা হয়। পেটাই লোহাতে খুব অল্প কয়লা মিশানো থাকে। তার চেয়ে একটু বেশি কয়লা দিলে তাহাই ইস্পাত হইয়া দাঁড়ায়। ঢালাই লোহাতে কিন্তু কয়লা খুব বেশি মিশাইতে হয়।

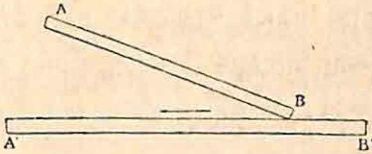
মনে কর, আমরা দুখানি লোহার ফলক লইয়া পরীক্ষা করিতেছি। প্রথম ফলকটি সাধারণ পেটাই লোহা অর্থাৎ কোমল লোহা (Soft Iron) দিয়া প্রস্তুত। দ্বিতীয় ফলকটি ইস্পাতে তৈয়ারি। কেবল তাহাই নয়, ইহাতে খুব পান্ দেওয়া আছে। তাই হাতুড়ির ঘা দিলে ইহা টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙিয়া যায়। একটা বড় চুম্বকের কাছে প্রথম ফলককটিকে রাখিলে তাহাতে চুম্বকের আবেশ হয় বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। চুম্বক সরাইলেই ইহা চুম্বক-ধর্ম্ম হারাইয়া সাধারণ লোহা হইয়া পড়ে। কিন্তু দ্বিতীয়টাকে লইয়া সেই পরীক্ষা করিলে তাহাতে যে চুম্বক-শক্তি জন্মে, তাহা স্থায়ী হইয়া যায়। এই দুই ঘটনার কারণ দেখাইতে গিয়া বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, কোমল লোহার তৈয়ারি ফলকের অণুগুলি চুম্বকের আকর্ষণে এক পাশে ফিরিলে, তাহারা সেই ভাবে থাকিতে চায় না। তাই চুম্বকটিকে সরাইয়া, ফেলিবামাত্র অণুগুলি আগের মতো ওলট্-পালট্ হইয়া চুম্বক-শক্তি হারায়! কিন্তু পান্-দেওয়া ইস্পাতের ফলকের অণুগুলি সে-রকম ওলট্-পালট্ হইতে পারে না। চুম্বকের টানে তাহার প্রত্যেক অণুর দক্ষিণ-মেরু

একধারে এবং উত্তর-মেরু অন্য ধারে আসিয়া দাঁড়াইলে চুম্বককে সরাইয়া লইলেও সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না। কাজেই, কঠিন ইস্পাতের ফলকে যে চুম্বকত্বের আবেশ হয়, তাহা স্থায়ী হইয়া দাঁড়ায়।

চুম্বক প্রস্তুত-প্রণালী ও বৈদ্যুত চুম্বক

লোহাকে কি-রকমে চুম্বক করা যায়, তোমাদিগকে এখন তাহা বলিব। আগেই দেখিয়াছ, সাধারণ লোহাতে যে চুম্বকত্বের আবেশ হয়, তাহা স্থায়ী হয় না। তাই চুম্বকের জন্য সাধারণ লোহার বদলে পান্-দেওয়া ইস্পাত ব্যবহার করিতে হয়। ঘড়ির স্প্রিং ভালো ইস্পাতে তৈয়ারি করা হয় এবং তাহাতে বেশ পান্ দেওয়াও থাকে। ভাঙা ঘড়ির স্প্রিং হইতে তিন চারি ইঞ্চি পরিমাণ কাটিয়া লইয়া তোমরা পরীক্ষা করিয়ো। স্প্রিং না পাইলে ইস্পাত লইয়া কামারের দোকানে পান্ দিয়া লইতে হইবে। পান্ দেওয়া কাহাকে বলে বোধ করি তোমরা সকলে তাহা জানো না। হাফরের আগুনে ইস্পাত যখন লাল হইয়া উঠে, তখন তাহাকে হঠাৎ জলে ডুবাইয়া ঠাণ্ডা করিলে পান্ দেওয়া হয়। পান্ দেওয়ার তাক্ আছে। বেশি পান্ দিলে ইস্পাত সামান্য আঘাতে মট্ মট্ করিয়া ভাঙিয়া যায়। যাহারা কামারের কাজ করে, তাহারা পান্ দিবার তাক্ জানে।

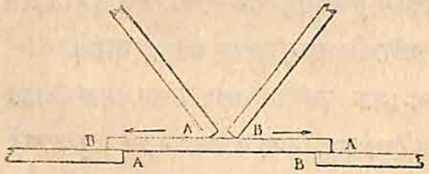
এখানে যে ছবি দিলাম, তাহার "A B" একটি স্থায়ী চুম্বক এবং "A^1 B^1" একখানি ইস্পাত। চুম্বকের "A" প্রান্তে উত্তর-মেরু এবং "B" প্রান্তে দক্ষিণ-মেরু আছে। ইস্পাতকে চুম্বক করিতে গেলে স্থায়ী চুম্বকের একটা প্রান্তকে ইস্পাতের এক প্রান্তে ছোঁয়াইতে হয় এবং তার পরে উহাকে ইস্পাতের অপর প্রান্ত



পর্য্যন্ত টানিয়া আনিতে হয়। ছবিতে তাহাই আঁকা আছে। দেখ, চুম্বকের দক্ষিণ-মেরু "B"-কে ইস্পাতের ডাইন প্রান্তে ছোঁয়াইয়া বাম দিকে টানিয়া আনা হইতেছে। এই-রকমে চুম্বকখানিকে ইস্পাতের দুই পিঠে বার বার টানিয়া লইলেই তাহা চুম্বক হইয়া যায়। এই নূতন চুম্বকের দক্ষিণ-মেরু ডাইনে এবং উত্তর-মেরু বাঁয়ে হইয়া পড়ে। কেন ইহা হয়, বলা কঠিন নয়। চুম্বকের দক্ষিণ-মেরুকে যেমন বাঁ দিকে টানা যায়, সঙ্গে সঙ্গে ইস্পাতের অণুগুলি ঘুরিয়া তাহাদের উত্তর-মেরুকে বাঁয়ে রাখিতে আরম্ভ করে। কাজেই, চুম্বকের দক্ষিণ-মেরুকে ডাইন হইতে বাঁয়ে টানিলে, ইস্পাতের বাঁয়ে

উত্তর-মেরু এবং ডাইনে দক্ষিণ-মেরু উৎপন্ন হয়। তোমরা মনে রাখিয়ো, চুম্বককে ইস্পাতের উপর দিয়া টানিবার সময়ে টানের দিক্ একই রাখা দরকার। একবার ডাইন হইতে বাঁয়ে, আর একবার বাঁ হইতে ডাইনে টানিলে ইস্পাতকে চুম্বক করা যায় না। তা-ছাড়া একবার উত্তর-মেরু এবং আর একবার দক্ষিণ-মেরু দিয়া টানিলেও ইস্পাত চুম্বক হয় না। ইস্পাতের উপরে চুম্বকের একই মেরুকে বার বার একই দিকে টানা দরকার।

আর এক রকমে ইস্পাতকে চুম্বক করা যায়। কিন্তু ইহাতে দু'খানি স্থায়ী চুম্বকের দরকার হয়। এখানকার ছবিখানি দেখিলে কি রকমে দু খানা চুম্বক দিয়া ইস্পাতকে চুম্বক করা যায় বুঝিতে পারিবে। ছবির



চুম্বক প্রস্তুত-প্রণালী

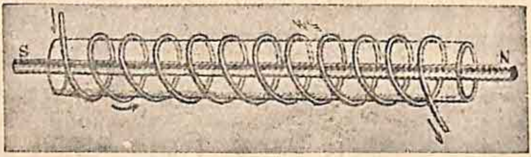
"A B" অংশ একখানি পান্ দেওয়া কঠিন ইস্পাত। ইহার উপরে যে-দুটি ফলক হেলানো রহিয়াছে, তাহা

স্থায়ী চুম্বক। "A" এবং "B" উহাদের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু। ইস্পাতের ঠিক্ মাঝে চুম্বক দু'খানির উত্তর ও দক্ষিণ মেরু রাখিয়া যদি ঠিক্ ছবির মতো "B" মেরুকে ডাইনে এবং "A" মেরুকে বাঁয়ে টানিতে পারো, তাহা হইলে ইস্পাতখানিকে তোমরা নিশ্চয়ই চুম্বক হইতে দেখিবে। এই নূতন চুম্বকের দক্ষিণ-মেরুকে বাঁয়ে এবং উত্তর-মেরুকে ডাইনে থাকিতে দেখা যাইবে। অণুর চুম্বকত্ব সম্বন্ধে যাহা আগে বলা হইয়াছে, তাহা যদি তোমাদের স্মরণ থাকে, তবে কেন ইহা ঘটে তোমরা নিজেরাই বলিতে পারিবে।

স্থায়ী চুম্বক ঘষিয়া কি-রকমে ইস্পাতকে চুম্বক করা যায় বলিলাম। ইহাতে বিশেষ হাঙ্গামা নাই। তোমরা নিজে নিজে এই-রকমে চুম্বক তৈয়ারি করিতে পারিবে। বিদ্যুৎ দিয়া কি-রকমে চুম্বক তৈয়ারি করা যায়, সেই কথাটা এখন তোমাদিগকে বলিব। তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয় ত বিদ্যুৎ দেখিয়াছ। মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ চলা-ফেরা করে; বিদ্যুৎ দিয়া ট্রামগাড়ী চলে; বিদ্যুতে আমরা টেলিগ্রাফে ও টেলিফোনে খবর পাঠাই। সহরের ঘরে ঘরে দুটা করিয়া বিদ্যুতের তার লাগানো থাকে। সেই তারের

দুই প্রান্তে থাকে বিজ্‌লী বাতি অর্থাৎ ইলেক্‌ট্রিক্‌ ল্যাম্প। তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলিলেই বাতি জ্বলিয়া উঠে।

এখানে যে ছবিটি দিলাম, তাহা কিসের, বোধ করি তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না। একটা কাচের নলের উপরে তার জড়াইলে যে-রকম দেখায় ছবিটিকে সেই রকমে আঁকিয়া দিয়াছি। এই তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলিতেছে। বিদ্যুৎ তারের ডাইন প্রান্তে



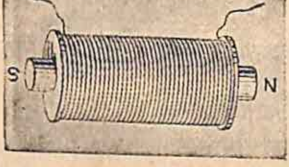
বিদ্যুতের সাহায্যে চুম্বক-প্রস্তুত

প্রবেশ করিয়া বাঁ প্রান্ত দিয়া বাহির হইতেছে। শর-চিহ্ন দিয়া তাহা বুঝাইয়া দিয়াছি। ঘরে ইলেক্‌ট্রিক্‌ বাতির জন্য যে বিদ্যুতের তার লাগানো থাকে, তোমরা তাহা ভালো করিয়া দেখিয়াছ কি? তামার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ ভালো চলে, তাই এ সব তার তামা দিয়া তৈয়ারি করা হয়। তা'ছাড়া তারগুলি আবার কাপাস বা রেশমের সূতা দিয়া মোড়া থাকে। কখনো কখনো

রবার গটাপার্চা বা সেই রকম কোনো জিনিষ তারের গায়ে লাগাইয়া রাখা হয়। কেন ইহা করা হয়, বোধ করি তোমরা জানো না। সূতা রেশম, রবার প্রভৃতি জিনিষের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলিতে পারে না। তাই এই-সব-জিনিষে-মোড়া তারের ভিতর দিয়া যখন বিদ্যুৎ চলাফেরা করে, তখন তাহা তারের ভিতরেই আট্কাইয়া থাকে। এই রকম তার গায়ে-গায়ে লাগিয়া থাকিলেও তাহার এক অংশের বিদ্যুৎ অন্য অংশে যাইতে পারে না। ছবির কাচের নলে যে তার জড়ানো আছে, তাহা ঐ রকম সূতা বা রেশম-মোড়া তার। ছবিতে দেখ, নলের ভিতরে একটা লম্বা ইস্পাত লাগানো আছে। আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, এই অবস্থায় নলে-জড়ানো তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলিলেই ইস্পাতখানা নিমেষের মধ্যে চুম্বক হইয়া যায়। তোমরা এই পরীক্ষাটি নিজের হাতে করিয়ো। তোমাদের কাহারো কাহারো কাছে হয় ত ইলেক্‌ট্রিক্ টর্চের জন্য বিদ্যুৎ-কোষ (Cell) আছে। সেই কোষের দুই প্রান্ত নলের তারের দুই প্রান্তে লাগাইয়া দিয়ো। দেখিবে, কোষের বিদ্যুৎ যেই তারের ভিতর দিয়া চলিতে থাকিবে, অমনি নলের ভিতরকার ইস্পাত চুম্বক হইয়া

দাঁড়াইতেছে। এই রকমে বিদ্যুৎ দিয়া যে চুম্বক তৈয়ারি করা যায়, তাহার জোর অন্য উপায়ে প্রস্তুত চুম্বকের চেয়ে অনেক বেশি হয়।

এখন পরের ছবিখানি লক্ষ্য কর। ইহা কিসের ছবি বোধ করি তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না। রীলের সূতার যে কাঠিম্ থাকে, তাহাতে রেশম-মোড়া তার জড়াইয়া এই ছবিটি সেই রকমে আঁকা হইয়াছে। ঘুড়ির লাটাইয়ে তোমরা যেমন সূতার উপরে সূতা জড়াও, তেমনি কাঠিমের উপরে একটা লম্বা তারকে বার বার জড়ানো হইয়াছে। তারের এক প্রান্ত বাঁ-দিকে অন্য প্রান্ত ডাইনে দেখা যাইতেছে। এই রকমে তার-জড়ানো কাঠিমকে বেষ্টনী (Coil) বলা হয়। বেষ্টনীর মাঝে যে ছিদ্র আছে, এখন তাহার ভিতরে একটা ইস্পাতের দণ্ডকে পরাইয়া দাও এবং আগের মতো কোষের বিদ্যুৎ তারের ভিতর দিয়া চালাইতে থাকো। দেখিবে, এখানেও ইস্পাতটি এক মুহূর্তে স্থায়ী চুম্বক হইয়া যাইবে।



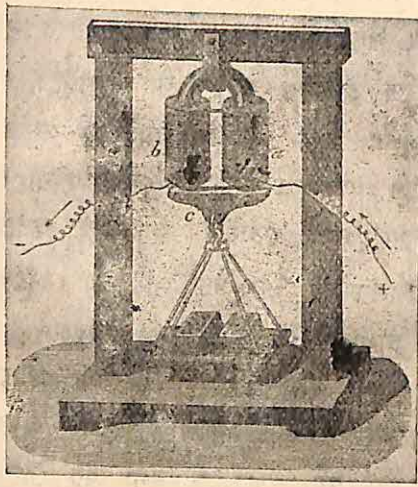
বেষ্টনী

এখন ছবির সেই তারের বেষ্টনীর মধ্যে ইস্পাত

না দিয়া সাধারণ নরম লোহা দেওয়া গেল। এই অবস্থায় লোহাটিতে একটি মজার ব্যাপার দেখা যায়। চুম্বকের কাছে সাধারণ লোহা রাখিলে তাহা যেমন অস্থায়ী চুম্বক হইয়া দাঁড়ায়, এখানে তাহাই দেখা যাইবে। কোমল লোহা বেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া চুম্বক হইবে বটে, কিন্তু সে চুম্বকত্ব স্থায়ী হইবে না। যেই বেষ্টনী হইতে তাহাকে বাহিরে আনা যাইবে, বা বেষ্টনীর তারের বিদ্যুৎ চলা বন্ধ করা যাইবে, অমনি সেখানি চুম্বকের গুণ হারাইয়া সাধারণ লোহা হইয়া দাঁড়াইবে। আশ্চর্য্য নয় কি? তোমরা কাঠিমের সূতার রীলের গায়ে তার জড়াইয়া এবং টর্চ লাইটের কোষের বিদ্যুৎ তাহাতে চালাইয়া এই পরীক্ষা করিয়ো; লোহাতে অস্থায়ী চুম্বকের কাজ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবে। এই রকমে তারের বেষ্টনীর মধ্যে বিদ্যুৎ চালাইয়া যে অস্থায়ী চুম্বক হয়, তাহাকে বলা হয় বৈদ্যুত চুম্বক (Electro-magnet)। স্থায়ী চুম্বকের চেয়ে সেই আকারের বৈদ্যুত চুম্বকের জোর বেশি হয়। এজন্য আজকাল এই চুম্বক দিয়া কল-কারখানার অনেক কাজ চালানো হইতেছে। তাছাড়া মোটর ডাইনামো টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও ইলেকট্রিক্ ঘণ্টার কাজ বৈদ্যুত

চুম্বক ছাড়া কোনো মতেই চলে না। তোমাদিগকে তাহার কথা পরে বলিব।

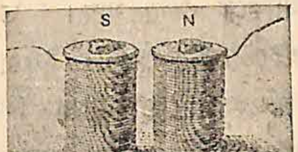
এখানে একটি বৈদ্যুত চুম্বকের ছবি দিলাম। ছবিতে দেখ, একই তার দিয়া দুইটি বেষ্টনী করা হইয়াছে।



বৈদ্যুতিক চুম্বকের কাজ

তার পরে একটা কোমল লোহাকে ইংরাজী "U" অক্ষরের মতো বাঁকাইয়া তাহার দুই শাখাকে ঐ দুইটি বেষ্টনীর মধ্যে রাখা হইয়াছে। এখন তাহাদের তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালাইলে কি হয়, বলা যায় না কি?

ঠিক্ আগের মতোই বাঁকা লোহাটি অস্থায়ী চুম্বক হইয়া দাঁড়ায়। "N" এবং "S" তাহার উত্তর ও দক্ষিণ মেরু হইয়া পড়ে। এই বৈদ্যুত চুম্বকের কাছে এক টুকরা লোহাকে ধরিলে "S" এবং "N" তাহাকে জোরে টানিয়া লয়। কিন্তু যেই বিদ্যুৎ চালানো বন্ধ করা যায়, অমনি তাহার সব শক্তি লোপ পায়। ছবিতে দেখ, বৈদ্যুত-চুম্বকের "*a b*" চিহ্নিত তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলিতেছে বলিয়া উহা "*c*" চিহ্নিত লোহাকে জোরে টানিয়া রাখিয়াছে। কেবল ইহাই নয়, লোহার টুকরার আংটায় যে পাল্লা লাগানো রহিয়াছে, তাহাতে দশ সের ওজনের বাট্‌খারা চাপানো আছে। বৈদ্যুত-চুম্বক এতটা ভারকেও শূন্যে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। লোহার কারখানার খুব বড় বড় লোহাকে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় সরাইতে হয়। তাছাড়া



সাধারণ বৈদ্যুত চুম্বক

লোহার জিনিষ তৈয়ারি হইয়া গেলে সেগুলিকে দেশ-দেশান্তরে জাহাজ বোঝাই করিয়া পাঠাইতে হয়। ভাবিয়া দেখ, এই-সব লোহা-লক্কড়কে

নড়াইতে কত কুলি-মজুর লাগে। আজকাল কেবল বৈদ্যুত চুম্বক দিয়া ভারী ভারী লোহাকে যেখানে খুসি সরানো হইতেছে। জাহাজে ও কারখানায় এখন বড় বড় বৈদ্যুত-চুম্বক রাখা হয়। বিদ্যুৎ চালাইলেই সেগুলি চুম্বক হইয়া ভারী লোহাকে যেখানে ইচ্ছা লইয়া যায়। সাধারণতঃ বৈদ্যুত চুম্বকের বেষ্টনীকে যে-রকম ভাবে তৈয়ারি করা হয়, পূর্ব্ব-পৃষ্ঠায় তাহার একটি ছবি দিলাম।

বৈদ্যুত-চুম্বকের আর একটি ব্যবহারের কথা বলিব। বড় কারখানায় গাদা গাদা ধাতুর টুক্‌রা পড়িয়া থাকে। তাহাতে লোহা পিতল তামা দস্তা সীসা এবং আরো কত কি ধাতুর টুক্‌রা মিশিয়া থাকিতে দেখা যায়। ভাবিয়া দেখ, সেই সব গাদা হইতে কেবল লোহার টুক্‌রা বাছিয়া লওয়া কত কঠিন। আজকাল বৈদ্যুত-চুম্বক দিয়া লোহা বাছিয়া লওয়ার কাজ অতি-সহজে করা হইতেছে। বৈদ্যুত-চুম্বকের তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালাইলে উহা চুম্বক হইয়া দাঁড়ায়। তার পরে তাহাকে যেই গাদার উপরে ধরা যায়, অমনি লোহার টুক্‌রাগুলি চুম্বকের তলায় আসিয়া লাগে। এইরকমে নানা ধাতুর মধ্য হইতে লোহাকে

পৃথক্ করা হইতেছে। তোমরা বোধ হয় দেখ নাই, দরজিদের কাছেও কখনো কখনো ছোটো চুম্বক থাকে। এই চুম্বক কিন্তু বৈদ্যুত-চুম্বক নয়,—সাধারণ স্থায়ী চুম্বক। জামা কাপড় শেলাই করিবার সময়ে ইস্পাতের ছুঁচ চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িলে সেগুলিকে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হয়। তাই দর্জিরা ঐ চুম্বক বুলাইয়া ছুঁচ্গুলিকে সংগ্রহ করে। আজকালকার ডাক্তার মহাশয়েরাও চিকিৎসার জন্য বৈদ্যুত-চুম্বক ব্যবহার করেন। মনে কর, কারখানায় লোহা পিটাইবার সময়ে কোনো মজুরের চোখে লোহার কুচি বিঁধিয়া গিয়াছে। চোখের মতো জায়গা হইতে লোহার কুচি খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। কাটাকুটি করিতে গেলে চোখ নষ্ট হইয়া যায়। তাই ডাক্তারেরা চোখের খুব কাছে একটা প্রকাণ্ড বৈদ্যুত-চুম্বক রাখিয়া তাহার তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালনা করেন। তার পরে সেই চুম্বকের টানে চোখের ভিতরকার লোহার কুচি আপনিই বাহির হইয়া আসে।

পর-পৃষ্ঠায় একটা ছবি দিলাম। ইহা কিসের ছবি বোধ করি তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না। বাঁকানো কোমল লোহাকে কি-রকমে তারের বেষ্টনীর মধ্যে

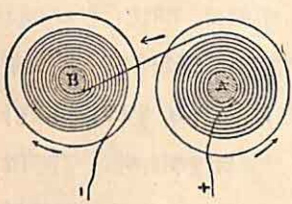
নড়াইতে কত কুলি-মজুর লাগে। আজকাল কেবল বৈদ্যুত চুম্বক দিয়া ভারী ভারী লোহাকে যেখানে খুসি সরানো হইতেছে। জাহাজে ও কারখানায় এখন বড় বড় বৈদ্যুত-চুম্বক রাখা হয়। বিদ্যুৎ চালাইলেই সেগুলি চুম্বক হইয়া ভারী লোহাকে যেখানে ইচ্ছা লইয়া যায়। সাধারণতঃ বৈদ্যুত চুম্বকের বেষ্টনীকে যে-রকম ভাবে তৈয়ারি করা হয়, পূর্ব্ব-পৃষ্ঠায় তাহার একটি ছবি দিলাম।

বৈদ্যুত-চুম্বকের আর একটি ব্যবহারের কথা বলিব। বড় কারখানায় গাদা গাদা ধাতুর টুক্‌রা পড়িয়া থাকে। তাহাতে লোহা পিতল তামা দস্তা সীসা এবং আরো কত কি ধাতুর টুক্‌রা মিশিয়া থাকিতে দেখা যায়। ভাবিয়া দেখ, সেই সব গাদা হইতে কেবল লোহার টুক্‌রা বাছিয়া লওয়া কত কঠিন। আজকাল বৈদ্যুত-চুম্বক দিয়া লোহা বাছিয়া লওয়ার কাজ অতি-সহজে করা হইতেছে। বৈদ্যুত-চুম্বকের তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালাইলে উহা চুম্বক হইয়া দাঁড়ায়। তার পরে তাহাকে যেই গাদার উপরে ধরা যায়, অমনি লোহার টুক্‌রাগুলি চুম্বকের তলায় আসিয়া লাগে। এইরকমে নানা ধাতুর মধ্য হইতে লোহাকে

পৃথক্ করা হইতেছে। তোমরা বোধ হয় দেখ নাই, দর্জিদের কাছেও কখনো কখনো ছোটো চুম্বক থাকে। এই চুম্বক কিন্তু বৈদ্যুত-চুম্বক নয়,—সাধারণ স্থায়ী চুম্বক। জামা কাপড় শেলাই করিবার সময়ে ইস্পাতের ছুঁচ চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িলে সেগুলিকে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হয়। তাই দর্জিরা ঐ চুম্বক বুলাইয়া ছুঁচ্গুলিকে সংগ্রহ করে। আজকালকার ডাক্তার মহাশয়েরাও চিকিৎসার জন্য বৈদ্যুত-চুম্বক ব্যবহার করেন। মনে কর, কারখানায় লোহা পিটাইবার সময়ে কোনো মজুরের চোখে লোহার কুচি বিঁধিয়া গিয়াছে। চোখের মতো জায়গা হইতে লোহার কুচি খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। কাটাকুটি করিতে গেলে চোখ নষ্ট হইয়া যায়। তাই ডাক্তারেরা চোখের খুব কাছে একটা প্রকাণ্ড বৈদ্যুত-চুম্বক রাখিয়া তাহার তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালনা করেন। তার পরে সেই চুম্বকের টানে চোখের ভিতরকার লোহার কুচি আপনিই বাহির হইয়া আসে।

পর–পৃষ্ঠায় একটা ছবি দিলাম। ইহা কিসের ছবি বোধ করি তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না। বাঁকানো কোমল লোহাকে কি-রকমে তারের বেষ্টনীর মধ্যে

রাখিতে হয়, তাহা তোমরা আগেই দেখিয়াছ। কিন্তু একটা লম্বা তারকে কি-রকমে জড়াইয়া বেষ্টনী তৈয়ারি করিতে হয়, তাহা এখনো দেখানো হয় নাই। এই ছবি দেখিলে বেষ্টনীতে তার জড়াইবার প্রণালী তোমরা বুঝিতে পারিবে। দেখ, বাঁয়ের বেষ্টনীতে তার যে-পাকে জড়ানো আছে, ডাইনের বেষ্টনীতে তারটিকে তাহারি ঠিক্ উল্টা পাকে জড়ানো হইয়াছে। এই রকম বেষ্টনীর মধ্যে রাখিয়া বিদ্যুৎ চালাইলে বাঁকানো লোহার এক শাখায় উত্তর-মেরু এবং অন্য শাখায় দক্ষিণ-মেরু হয়।



বেষ্টনীতে তার জড়াইবার প্রণালী

এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারো, লোহার কোন্ শাখায় কোন্ মেরু হয় তাহা আগে থাকিতে বলা যায় না কি? নিশ্চয়ই বলা যায়। উপরের ছবিখানি ভালো করিয়া দেখ। ডাইনের এবং বাঁয়ের বেষ্টনীতে কোন্ পাকে বিদ্যুৎ চলে, তাহা শর-চিহ্ন দিয়া আঁকিয়া দিয়াছি। ডাইনের বেষ্টনীতে বিদ্যুৎ চলিতেছে বাঁ হইতে ডাইনে এবং বাঁয়ের বেষ্টনীতে সেই বিদ্যুৎই

চলিতেছে উল্‌টা পাকে অর্থাৎ ডাইন হইতে বামে। ভালো করিয়া দেখিলেই বুঝিবে, ঘড়ির কাঁটা যে-দিক্ ধরিয়া চলে বাঁয়ের বেষ্টনীতে ঠিক্ সেই ভাবে বিদ্যুৎ চলিতেছে। ডাইনের বেষ্টনীতে সেই বিদ্যুৎই চলিতেছে ঘড়ির কাঁটার ঠিক্ উল্‌টা দিকে। তোমরা মনে রাখিয়ো, যে-বেষ্টনীতে ঘড়ির কাঁটার দিক্ ধরিয়া বিদ্যুৎ চলে তাহা হয় দক্ষিণ-মেরু এবং যাহাতে বিদ্যুৎ ঘড়ির কাঁটার উল্‌টা দিক্ ধরিয়া চলে তাহা হইয়া দাঁড়ায় উত্তর-মেরু। কাজেই ছবির ডাইন ধারের বেষ্টনীর ভিতরকার A-চিহ্নিত লোহাটি উত্তর-মেরু এবং বাঁয়ের B-চিহ্নিত লোহা দক্ষিণ-মেরু।

ছবিতে দেখ, ডাইনের বেষ্টনীর তারের ভিতরে ঘুরিয়া বিদ্যুৎ বাঁয়ের বেষ্টনীতে প্রবেশ করিতেছে। এখন যদি আমরা বিদ্যুতের দিক্ পরিবর্ত্তন করি—অর্থাৎ বিদ্যুৎকে বামের বেষ্টনীর মধ্যে ঘুরাইয়া ডাইনের বেষ্টনীতে প্রবেশ করাই, তাহা হইলে আর এক মজা দেখা যায়। তখন B-চিহ্নিত লোহা উত্তর-মেরু এবং A-চিহ্নিত লোহা দক্ষিণ-মেরু হইয়া পড়ে। কেন ইহা ঘটে বলা কঠিন নয়। কারণ এই অবস্থায় তারের বিদ্যুৎ A-চিহ্নিত লোহার চারিদিকে ঘড়ির কাঁটার দিক্

ধরিয়া চলে এবং B-চিহ্নিত লোহাকে বেড়িয়া তাহারি বিপরীত দিকে চলে। কাজেই A দক্ষিণ-মেরু এবং B উত্তর-মেরু হইয়া দাঁড়ায়।

বিদ্যুৎ-প্রবাহের দিক্ অনুসারে কোমল লোহা যে-নিয়মে কখনো উত্তর এবং কখনো দক্ষিণ-মেরু হয়, তাহা তোমরা মনে রাখিয়ো। নিজের হাতে বেষ্টনী তৈয়ারি করিয়া এবং তাহার ভিতরে লোহা রাখিয়া পরীক্ষা করিলে নিয়মটি তোমাদের মনে থাকিবে।

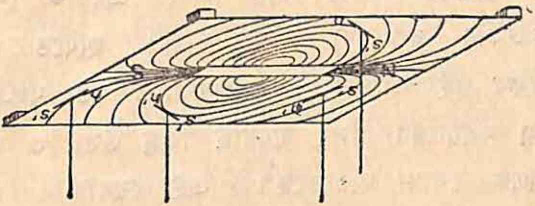
চুম্বকের বল-ক্ষেত্র

একটা বড় চুম্বককে কাগজ বা কাঠের বাক্সে পূরিয়া রাখো। তার পরে একটা কম্পাস্ বা লোহার টুক্‌রাকে বাক্সের কাছে লইয়া যাও। দেখিবে, বাক্সে আবদ্ধ থাকিয়াও চুম্বক কম্পাসের কাঁটাকে এবং লোহাকে টানিতেছে। তাহা হইলে বুঝা গেল, চুম্বকের আকর্ষণ কাগজ, কাঠ বা বাতাসের বাধা মানে না। একটা চুম্বককে কাঁচের বোতলের ভিতরে রাখিয়া পরীক্ষা কর। এখানেও দেখিবে, কাঁচের বাধা ভেদ করিয়া চুম্বকটি বাহিরের লোহাকে টানিতেছে। কাজেই বলিতে হয়, গ্রহ-নক্ষত্রেরা আকাশে থাকিয়া যে-রকম বলে পরস্পরকে আকর্ষণ করে, শূন্যে ঢিল ছুড়িলে তাহা যে-রকম বলে নীচে নামে, চুম্বকের আকর্ষণ সেই-রকমই একটা কিছু। এই আকর্ষণ কি-রকমে জন্মে তাহা এপর্য্যন্ত ঠিক্ জানা যায় নাই। তবে যেখানে চুম্বক থাকে তাহার চারিদিকে যে, বল-ক্ষেত্র জন্মে তাহা প্রত্যক্ষ দেখানো যায়। এখন

তোমাদিগকে চুম্বকের বল-ক্ষেত্রেরই কথা বলিব। কোনো চুম্বকের চারিদিকে যে-জায়গায় তাহার আকর্ষণ বা বিকর্ষণের শক্তি বুঝা যায়, তাহাকেই বলা হয় চুম্বকের বল-ক্ষেত্র (Magnetic field)। চুম্বক হইতে যত দূরে যাওয়া যায়, তাহার বল-ক্ষেত্রের শক্তিও তত কমিতে থাকে। কোনো চুম্বকের কাছে একটি কম্পাস্ রাখিলে তাহা যত জোরে বিচলিত হয়, দূরে লইয়া গেলে তাহাকে কখনই তত জোরে বিচলিত হইতে দেখা যায় না।

চুম্বকের আকর্ষণ-বিকর্ষণ কি-রকমে কাজ করে, পর পৃষ্ঠার ছবিটি দেখিলে তোমরা আন্দাজ করিতে পারিবে। ছবিতে দেখ, একটা লম্বা স্থায়ী চুম্বক সাদা কাগজের উপরে পড়িয়া আছে। "N" এবং "S" তাহার উত্তর ও দক্ষিণ-মেরু। "N S" চিহ্নিত খুব ছোটো কম্পাসের কাঁটাকে চুম্বকের উত্তর-মেরুর কাছে রাখা হইয়াছে। এখন কাঁটার অবস্থা কি হইবে বলা যায় না কি? ইহার "S"-চিহ্নিত দক্ষিণ-মেরুকে চুম্বকের উত্তর-মেরু টানিতে থাকিবে, আবার "N"-চিহ্নিত উত্তর-মেরুকে চুম্বকের দক্ষিণ-মেরু কাছে আনিতে চেষ্টা করিবে। কাজেই, দো-টানার মধ্যে

পড়িয়া কম্পাসের কাঁটা বাঁকিয়া দাঁড়াইবে। দেখ, ছবিতে তাহাই আঁকা আছে। এই অবস্থায় কম্পাস্ যে-রকমে দাঁড়াইয়াছে, তাহাই ঐ জায়গার আকর্ষণের দিক্। তার পরে দেখ, কম্পাস্‌টিকে



চুম্বক ও কম্পাসের কাঁটা

আরো খানিকটা ডাইনে সরাইয়া চুম্বকের দক্ষিণ-মেরুর কাছে আনা গিয়াছে। এখন কম্পাসের কাঁটায় উত্তর ও দক্ষিণ-মেরুর টান আগের মতো নাই। কাজেই, উহা আর একভাবে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এখানকার আকর্ষণের দিক্ অন্য রকম হইয়া গিয়াছে। তোমরা একটা ছোটো কম্পাস্‌কে চুম্বকের উত্তর বা দক্ষিণ-মেরু হইতে আরম্ভ করিয়া এই রকমে তাহার বিপরীত মেরু পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে লইয়া যাইয়ো এবং প্রত্যেক স্থানে কাঁটা যেরূপভাবে থাকে, তাহা পেন্‌সিল্ দিয়া সেই সাদা কাগজের উপরে রেখা টানিয়ো। সব

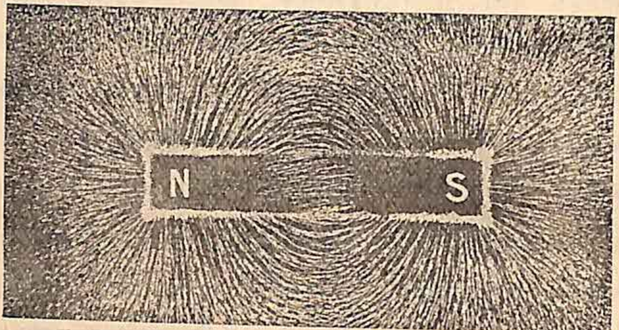
রেখা টানা হইলে দেখিবে, রেখাগুলি বাঁকিয়া চুম্বকের দুই মেরুকে সংযুক্ত করিয়াছে। ইহাই চুম্বকের একটি বল-রেখা (Line of force)। এই রকমে কম্পাসের কাঁটাকে নানা পথ ধরিয়া এক মেরু হইতে অন্য মেরুতে লওয়া যায় এবং প্রত্যেক পথেই এক-একটা বল-রেখা আঁকা চলে। ছবিতে দেখ, চুম্বকের দুই পাশেই এই প্রণালীতে কত বল-রেখা টানা হইয়াছে। সব রেখাই কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ মেরুকে যোগ করিতেছে। এই রেখাগুলি লইয়া যে-ছবিটি হইয়াছে, তাহাই চুম্বকখানির বল-ক্ষেত্রের চিত্র।

ছবির বল-রেখাগুলিকে তোমরা কাল্পনিক ব্যাপার মনে করিয়ো না। চুম্বকের আকর্ষণ সত্যই ঐ সকল রেখা ধরিয়া কাজ করে। মনে করা যাউক, যেন কোনো ছোটো কম্পাসের কাঁটার কেবল উত্তর-মেরুকে ছবির চুম্বকের উত্তর-মেরুর কাছে ধরা হইয়াছে। এই অবস্থায় কি হইবে বলা যায় না কি? দুই উত্তর মেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। কাজেই, কাঁটার উত্তর-মেরু চুম্বকের জোরালো উত্তর-মেরু হইতে দূরে যাইতে থাকিবে। এই রকমে মাঝ পথ ছড়াইয়া

যখন চুম্বকের দক্ষিণ-মেরুর কাছে আসিবে, তখন তাহাই দক্ষিণ-মেরুর টানে নীচে নামিয়া ঐ মেরুর গায়ে গিয়া ঠেকিবে। কাঁটার উত্তর-মেরুর এই রকমে যে একটি বাঁকা পথ ধরিয়া চলিল, তাহাই একটি বল-রেখা। এই রকমে চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ-মেরু যোগ করিয়া অসংখ্য বল-রেখা টানা যাইতে পারে। সুতরাং বল-রেখা কাল্পনিক রেখা নয়, ঐগুলি ধরিয়াই চুম্বকের আকর্ষণ চলে। এই বল-রেখার সাহায্যে চুম্বকের আকর্ষণ-বিকর্ষণ নির্দ্দেশ করা যায়।

বল-রেখা চাক্ষুষ দেখার জন্য আর কতকগুলি পরীক্ষার কথা তোমাদিগকে বলিব। পর-পৃষ্ঠায় একটি ছবি দিলাম। ইহার N S একটি সাধারণ চুম্বক। N উত্তর-মেরু এবং S দক্ষিণ-মেরু। এই চুম্বককে একটা সাদা কাগজে ঢাকিয়া তাহার উপরে লোহার গুঁড়া ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তার পরে গুঁড়া যাহাতে কাগজের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে, তাহার জন্য উহাতে ধীরে ধীরে আঙুলের টোকা দিয়াছিলাম। ইহাতেই লোহার গুঁড়া ছবির মতো আকৃতি পাইয়াছিল। তোমরা চুম্বক ও লোহার গুঁড়া লইয়া এই পরীক্ষা করিয়ো। দেখ, উত্তর ও দক্ষিণ-মেরুকে যোগ করিয়া

কত অসংখ্য রেখা রহিয়াছে। লোহার গুঁড়াই এ-সব রেখা রচনা করিয়াছে। এইগুলিই বল-রেখা। লোহার গুঁড়া কেন এ-রকম রেখার আকার পায় তাহা বলা কঠিন নয়। চুম্বকের কাছে কোনো লোহা

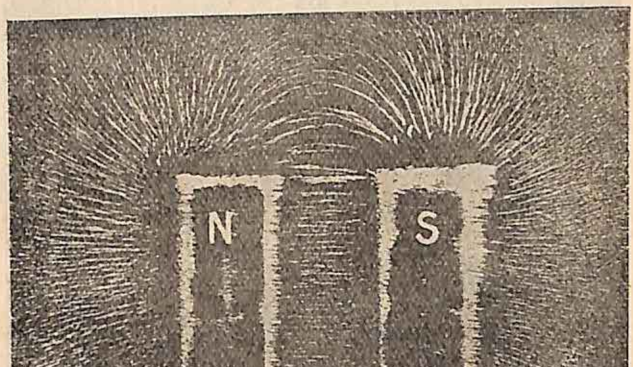


চুম্বকের বল-রেখা

রাখিলে তাহার দুই প্রান্তে চুম্বক-শক্তির আবেশ হয়, তাহা তোমরা জানো। এখানে লোহার গুঁড়ার প্রত্যেক কণায় চুম্বক-শক্তির আবেশ হইয়াছে; তাহাতেই এক কণা তাহার কাছের কণাকে আকর্ষণ করিয়া এই রেখার আকার পাইয়াছে। চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ-মেরু যে পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তাহা রেখাগুলি দেখিলে বুঝা যায় না কি? দেখিলেই

বোধ হইতেছে, কে যেন উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে একগাছি সূতা বাঁধিয়াছে এবং সূতার মাঝখানটাকে ধরিয়া টানিতেছে। তাই রেখাগুলি সূতার মতোই বাঁকিয়া গিয়াছে।

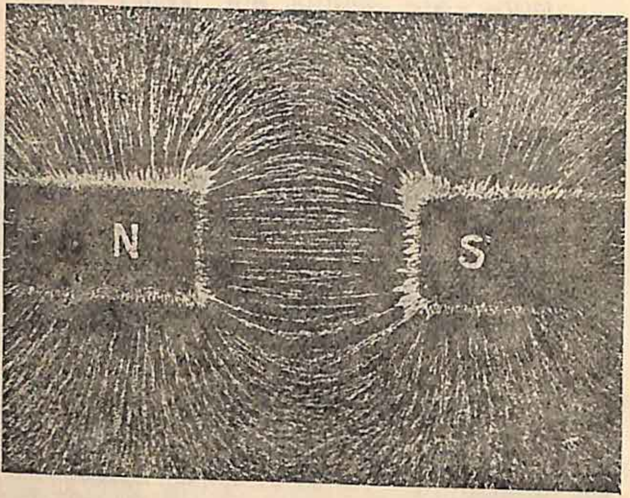
এখানে আর দুইখানি ছবি দিলাম। দুইখানি পৃথক্ চুম্বকের একের উত্তর-মেরুকে অপরের দক্ষিণ-



(১) উত্তর ও দক্ষিণ-মেরু বল-রেখা

মেরুর কাছে রাখা হইয়াছিল। তার পরে আগের মতো কাগজের উপরে লোহার গুঁড়া ছিটাইলে এই ছবি পাওয়া গিয়াছিল। দেখ, উপরের চিত্রে মেরু খুব

কাছাকাছি আছে বলিয়া বল-রেখাগুলি কত সুস্পষ্ট চুম্বক দুইখানির মাঝামাঝি জায়গায় বল-রেখা খুব অল্প এবং সেগুলিকে প্রায় সোজা দেখাইতেছে। চুম্বকের শক্তি তাহার দুই মেরুতেই থাকে, মাঝামাঝি

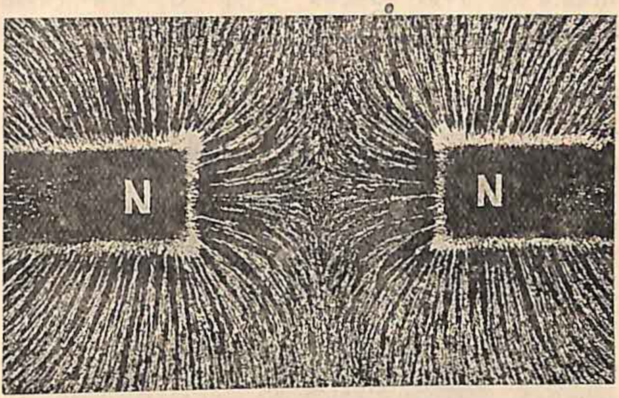


(২) উত্তর ও দক্ষিণ-মেরুর বল-রেখা

জায়গায় তাহার লক্ষণ ধরা যায় না। ইহাতেই মাঝের জায়গার বল-রেখার জোর এত কম।

এখন পর-পৃষ্ঠার ছবিখানি দেখ। ইহা কি-রকমে আঁকা হইয়াছে, একবার দেখিলেই তাহা তোমরা

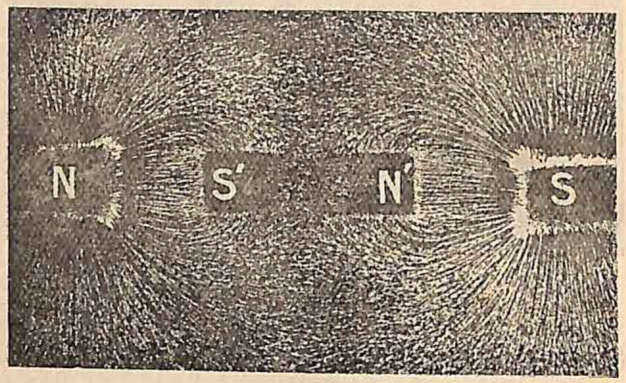
বুঝিতে পারিবে। দুইখানি চুম্বকের দুই উত্তর-মেরুকে কাছাকাছি রাখিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলাম। একের



দুই উত্তর-মেরুর বল রেখা

উত্তর-মেরু অন্যের উত্তর-মেরুকে বিকর্ষণ করে। অর্থাৎ উহারা পরস্পর দূরে যাইবার চেষ্টা করে। ছবির বল-রেখাতেও তাহাই দেখা যাইতেছে। দেখ, দুই মেরু বল-রেখা দ্বারা সংযুক্ত নয়,—এক মেরুর রেখা অন্য মেরুর রেখা হইতে দূরে যাইবার জন্য বাঁকিয়া গিয়াছে। দুই চুম্বকের একই জাতীয় মেরু যে পরস্পরকে বিকর্ষণ করে, ইহাতে তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

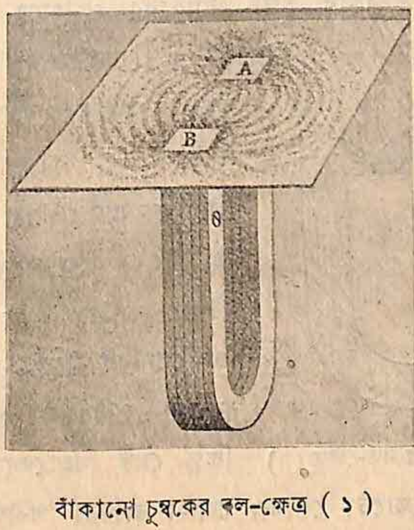
নীচে যে বল-ক্ষেত্রের ছবিটি দেওয়া গেল, তাহা কি-রকমে পাওয়া গিয়াছে, বোধ করি বুঝিতে পারিয়াছ। দুইটা চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ-মেরুর ঠিক্ মাঝে এক টুক্‌রা কোমল লোহা রাখা হইয়াছিল। কাজেই, উহার যে দুই প্রান্ত উত্তর ও দক্ষিণ-মেরুর



দুই মেরুর মাঝে কোমল লোহার বল-রেখা

কাছে ছিল, সেখানে বিপরীত চুম্বক-শক্তির আবেশ হইয়াছিল। অর্থাৎ লোহার যে-প্রান্ত উত্তর-মেরুর কাছে ছিল, তাহা হইয়াছিল দক্ষিণ-মেরু এবং যাহা দক্ষিণ-মেরুর কাছে ছিল, তাহা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল উত্তর-মেরু। মাঝের কোমল লোহার দুই প্রান্তে S^1 N^1 অক্ষর দিয়া তাহাই দেখাইয়াছি। এখন

চুম্বক দুখানিকে ও লোহাকে আগের মতো কাগজ চাপা দেওয়ার পরে কাগজে লোহার গুঁড়া ছিটাইলে যাহা ঘটিয়াছিল, ছবিতে তাহাই আঁকা আছে। দেখ বল-রেখা দ্বারা NS[1] এবং SN[1] সংযুক্ত হইয়াছে। সাধারণ কোমল লোহাকে চুম্বকের কাছে রাখিলে যে চুম্বক-শক্তির আবেশ হয়, এই পরীক্ষার চিত্রে তাহা সুস্পষ্ট চোখে পড়ে।

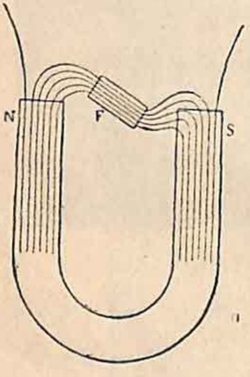


বাঁকানো চুম্বকের বল-ক্ষেত্র (১)

উপরের ছবিখানি লক্ষ্য কর। ইহা ঘোড়ার নালের মতো বাঁকানো চুম্বকের বল-ক্ষেত্র। ছবির A এবং

B উত্তর ও দক্ষিণ-মেরু। দেখ, রেখাগুলি কেমন উত্তর ও দক্ষিণ-মেরুকে যোগ করিয়া রহিয়াছে।

তোমাদের আগেই বলিয়াছি, তামা, পিতল, সীসা কাঠ, কাগজ, এমন কি ইট-পাথর প্রভৃতি মাঝে দাঁড়াইলে চুম্বকের শক্তি রোধ করিতে পারে না। ঘরের দেওয়ালের ভিতরে একটা বড় চুম্বক রাখিয়া যদি দেওয়ালের বাহিরে লোহা রাখা যায়, তাহা হইলেও ভিতরকার চুম্বক বাহিরের লোহাকে আকর্ষণ করে। চুম্বকের শক্তি ইট-কাঠ চুণ-বালির বাধা মানে না। সেই কারণে ঐ-সব জিনিষকে যদি তোমরা চুম্বকের বল-ক্ষেত্রের মধ্যে রাখো, তাহা হইলে বল-রেখাগুলি যেমন ছিল তেমনিই থাকে ; তাহাদের কোনো পরিবর্ত্তন হয় না।



বাঁকান চুম্বকের বল-ক্ষেত্র (২)

কিন্তু সেই বল-ক্ষেত্রেই যদি একখানি ছোটো কোমল লোহা রাখিয়া পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে এক মজার ব্যাপার দেখা যায়। তখন সেই লোহাই চারিপাশের বল-রেখাগুলিকে টানিয়া

নিজের কাছে আনে। তোমরা পূর্ব্বপৃষ্ঠার ছবিটি দেখিলে এই কথার অর্থ বুঝিতে পারিবে। দেখ, ছবিতে একটা বাঁকানো চুম্বক রহিয়াছে। ইহার বল-রেখা উত্তর ও দক্ষিণ-মেরুকে সংযুক্ত করিয়া ছিল। এখন মাঝে এক টুক্‌রা কোমল লোহা রাখা হইয়াছে। ইহাতে সেই রেখাগুলি বাঁকিয়া কি-রকমে লোহার ভিতর দিয়া চলিয়াছে, ছবিখানি দেখিলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে। তাহা হইলে দেখ, কোমল লোহার গুণ অনেক। চুম্বকের কাছে থাকিলে তাহাতে অস্থায়ী চুম্বকত্বের আবেশ হয়; তা'ছাড়া সেই চুম্বকের বল-রেখাগুলিকে বাঁকাইয়া নিজের ভিতর দিয়া লইয়া যায়।

পৃথিবীর চৌম্বক-শক্তি

তোমরা আগে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ, কোনো চুম্বককে কর্কের উপরে রাখিয়া জলে ভাসাইলে তাহা একটু এদিক্-ওদিক্ নড়াচড়া করিয়া উত্তর-দক্ষিণে লম্বা হইয়া দাঁড়ায়। কম্পাসের কাঁটাতেও আমরা তাহাই দেখিয়াছি। ঘুরাইয়া দিলেও এই কাঁটা আপনা হইতে উত্তর-দক্ষিণমুখো হয়। একটু লক্ষ্য করিলে দেখিবে, ঘুরাইবার পরে কাঁটাটি যখন এদিক্-ওদিকে সরিয়া কাঁপিতে থাকে, তখন স্পষ্টই বুঝা যায়, যেন কোনো শক্তি বাহির হইতে টানিয়া তাহাকে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা করিতেছে। কেন এমন হয় এবং কোন্ শক্তি চুম্বকের উত্তর-মেরুকে উত্তরে এবং দক্ষিণ-মেরুকে দক্ষিণে টানিয়া রাখে, তাহা বোধ করি তোমরা জানো না।

বৈজ্ঞানিকেরা এ-সম্বন্ধে যাহা বলেন, বড় মজার। তাঁহারা বলেন, আমাদের এই পৃথিবীটা নিজেই একটা প্রকাণ্ড চুম্বক। সাধারণ চুম্বকের দুই প্রান্তে যেমন দুই মেরু থাকে, তেমনি পৃথিবীরও দুই প্রান্তে

চুম্বকের দুইটা মেরু আছে। পৃথিবীর সেই মেরুই চুম্বকের মেরুকে টানিয়া উত্তর-দক্ষিণে দাঁড় করায়। পৃথিবীর চুম্বক-মেরু কোথায় আছে, তাহা ঠিক্ করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা এ-সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহারা সেই সকল পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন, পৃথিবীর উত্তরে ও দক্ষিণে যে দুই জায়গা চিরদিনই বরফে ঢাকা থাকে, সেই উত্তর এবং দক্ষিণ প্রদেশেই পৃথিবীর চুম্বক-মেরু আছে। তোমরা আগেই দেখিয়াছ, দুইটি চুম্বকের একের উত্তর-মেরু অন্যের দক্ষিণ-মেরুকে আকর্ষণ করে। কাজেই বলিতে হয়, পৃথিবীর উত্তরে যে মেরু আছে তাহার গুণ চুম্বকের দক্ষিণ-মেরুর মতো এবং দক্ষিণে যে মেরু রহিয়াছে তাহার গুণ চুম্বকের উত্তর-মেরুর সমান। আবার কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক বলেন, পৃথিবীর উত্তরে যে চুম্বক-মেরু আছে, তাহাকে উত্তর-মেরু এবং দক্ষিণের মেরুকে দক্ষিণ-মেরু বলাই ভালো। সুতরাং ইহাদের মতে সাধারণ চুম্বকের উত্তর-মেরুকে বলিতে হয়, দক্ষিণ-মেরু এবং তাহার দক্ষিণ-মেরুকে বলিতে হয় উত্তর-মেরু। নামের এই গোলমাল মিটাইবার জন্য চুম্বকের যে-মেরু উত্তর মুখে থাকে তাহাকে অনেকে

উত্তর-গামী (North-seeking) এবং যাহা দক্ষিণে থাকে তাহাকে দক্ষিণ-গামী (South-seeking) মেরু বলিতেছেন।

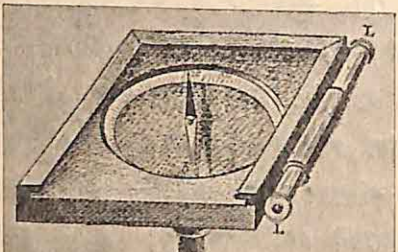
যাহা হউক, তোমরা নামের এই ঝঞ্ঝাট লইয়া ব্যস্ত হইয়ো না। কেবল মনে রাখিয়ো, আমাদের এই পৃথিবীটা একটি বড় চুম্বক। তাহার দুই মেরু আছে বরফে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণের হিম-প্রদেশে। পৃথিবীর সেই দুই মেরু চুম্বকের দুই মেরুকে টানিয়া উত্তর-দক্ষিণে স্থির রাখে। নৌকার সাম্‌নে দড়ি বাঁধিয়া ডাঙার দিকে টানিলে, তাহা ডাঙার দিকে মুখ ফিরায় এবং দড়ির টানে নদীর কিনারায় আসিয়া ঠেকে। ইহা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। তোমরা বোধ করি মনে করিতেছ, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু চুম্বকের মেরুকে সেই রকমেই টানে। কিন্তু তাহা নয়! পৃথিবী যদি চুম্বককে নৌকার দড়ির মতো টানিত, তাহা হইলে সেই টানে আমাদের যত চুম্বক আছে, তাহার সবগুলিই পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে গিয়া জমা হইত। কিন্তু তাহা তো হয় না। এই জন্য পৃথিবীর মেরুর টানকে দড়ির টানের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। এই টানে চুম্বককে কেবল উত্তর-দক্ষিণে লম্বা হইয়া থাকিতে

দেখা যায় মাত্র। অর্থাৎ চুম্বক কি-ভাবে দাঁড়াইবে, পৃথিবীর মেরু কেবল তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া দেয় মাত্র। টেবিলে একখানা বই পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা হইয়া রহিয়াছে মনে করা যাউক, ইহাকে উত্তর-দক্ষিণে রাখা দরকার। আমরা তখন বইখানিকে টানিয়া কাছে আনি না, যেখানকার বই সেখানেই থাকে, আমরা কেবল হাত দিয়া তাহাকে উত্তর-দক্ষিণে ঘুরাইয়া রাখি মাত্র। পৃথিবীর মেরুর টান কতকটা এই রকমেরই। তাহা চুম্বককে উত্তর-দক্ষিণে ঘুরাইয়া রাখে মাত্র।

উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব এবং পশ্চিম এই চারিটা দিক্ কি-রকমে ঠিক করা হয়, তোমরা সকলে বোধ করি তাহা জানো না। লাট্টু যেমন তাহার হুলের উপরে দাঁড়াইয়া ঘুরপাক খায়, পৃথিবীও সেই রকম এক নির্দ্দিষ্ট রেখাকে অবলম্বন করিয়া লাট্টুর মতোই ঘুরিতেছে। এই ঘুরপাক খাওয়াতেই যে, আমাদের দিবারাত্রি হয় এবং গ্রহ-নক্ষত্রের উদয়াস্ত হয়, তাহা বোধ করি তোমরা জানো। যাহা হউক এই নির্দ্দিষ্ট রেখাকে বলা হয় ধ্রুব-রেখা। ইহারি একটা দিক্‌কে আমরা উত্তর এবং অন্য দিক্‌টাকে দক্ষিণ বলি। তার পরে ঠিক্ উত্তর মুখে দাঁড়াইলে যে-দিক্ আমাদের ডাইনে

থাকে তাহাকে পূর্ব্ব এবং যাহা বাঁয়ে থাকে তাহাকে পশ্চিম নাম দেওয়া হয়। চুম্বকের কাঁটা উত্তর-দক্ষিণে দাঁড়ায়, এই কথাটা তোমরা বার বার শুনিয়াছ এবং নিজেরা পরীক্ষা করিয়াও দেখিয়াছ। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলে পৃথিবীর সব জায়গায় চুম্বকের কাঁটাকে ঠিক্ উত্তর-দক্ষিণে থাকিতে দেখা যায় না।

এখানে একটা কম্পাসের কাঁটার ছবি দিলাম। ভুগোলের উত্তর-দক্ষিণ রেখা হইতে চুম্বকের কাঁটার উত্তর-দক্ষিণ কত বাঁকিয়া আছে, ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। দেখ, কাঁটার উত্তর-মেরু প্রায় পঁচিশ ডিগ্রি পশ্চিমে এবং দক্ষিণ-মেরুও ঠিক্ সেই পরিমাণে পূর্ব্বে হেলিয়া রহিয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে কম্পাসের কাঁটা ঠিক উত্তর-দক্ষিণে দাঁড়ায় না।



কম্পাস্

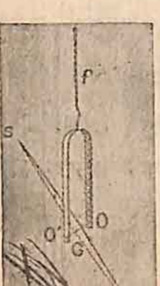
ভৌগোলিক উত্তর-দক্ষিণের সঙ্গে কম্পাসের কাঁটা

যে-কোণ করিয়া হেলিয়া থাকে, তাহাকে চৌম্বক দিক্‌পতন (Declination) বলা হয়। তাই সাধারণ কম্পাসের আর একটা নাম দিক্‌পতন-দর্শক কম্পাস্‌ (Declination Compass)। তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, চুম্বকের কাঁটার দিক্‌পতন বুঝি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এক। কিন্তু তাহা নয়। আমাদের ভারতবর্ষের দিক্‌পতন যাহা, ইংলণ্ডের তাহা নয়। আবার আমেরিকার দিক্‌পতনের সঙ্গে আফ্রিকার দিক্‌পতনের একটুও মিল দেখা যায় না। এমন কি, দুই শত মাইলের মধ্যেও দিক্‌পতন পৃথক্‌ হইতে দেখা যায়। কোনো জায়গার কম্পাসে উত্তর-মেরু পূর্ব্বে হেলিয়া আছে, ইহাও দেখা গিয়াছে। আবার পৃথিবীর মধ্যে এমন জায়গাও আছে, যেখানে কম্পাসের কাঁটা ভৌগোলিক উত্তর-দক্ষিণ রেখার সহিত হুবহু মিলিয়া থাকে। আরো মুস্কিল এই যে, কোনো জায়গার দিক্‌পতন চিরকাল একই থাকে না। তাহার পরিমাণ প্রায়ই বৎসরে বৎসরে একটু করিয়া পরিবর্ত্তিত হয়।

তাহা হইলে দেখ, কেবল কম্পাসের কাঁটা দেখিয়া ভৌগোলিক উত্তর-দক্ষিণ ঠিক্‌ করা যায় না। পৃথিবীর প্রত্যেক জায়গার দিক্‌পতন জানা থাকিলে খাঁটি দিক্‌

ঠিক করা যায়। এই জন্য সব দেশের নৌ-বিভাগ হইতে বৎসরে বৎসরে দিক্‌পতনের মানচিত্র প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক জাহাজে এক-একখানি সেই মানচিত্র থাকে। জাহাজের কাপ্তেন তাহারি সাহায্যে কোন্‌টা কোন্ দিক্ ঠিক্ করিয়া জাহাজ চালাইয়া থাকেন।

এখানে একটা ছবি দিলাম। বোধ করি বুঝিতে পারিয়াছ, ইহাও এক রকম কম্পাসের ছবি। সাধারণ কম্পাসের কাঁটা অনুপ্রস্থভাবে লাগানো থাকে বলিয়া তাহা যেমন পাশাপাশি চলাফেরা করে, এই কম্পাসের কাঁটা সে–রকমে লাগানো নাই। কাজেই ইহা পাশাপাশি নড়িতে পারে না। ইহা নিজের ভারকেন্দ্রে (Centre of gravity) লম্বভাবে (Vertically) লাগানো থাকে। তাই কাঁটা উপর–নীচে খেলিয়া বেড়ায়। ছবির কাঁটার "S" চিহ্নিত অংশ উত্তর-মেরু এবং "N" দক্ষিণ-মেরু। দেখ উত্তর-মেরু নীচের দিকে কত ঝুঁকিয়া রহিয়াছে।



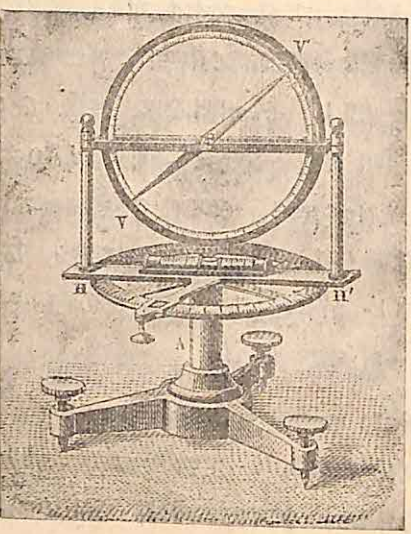
অধঃপতন

চুম্বকের কাঁটার ইহাও একটা ধর্ম্ম। যে-কাঁটা

অনুপ্রস্থভাবে নড়াচড়া করে, তাহার যেমন দিক্‌পতন আছে, তেমনি যাহা লম্বভাবে খেলিয়া বেড়াইতে পারে, তাহার অধঃপতন (Inclination) আছে। ঊর্দ্ধ-অধঃ অর্থাৎ খাড়া রেখার সহিত কাঁটা কত ডিগ্রী কোণে বাঁকিয়া আছে, দেখিয়া অধঃপতনের পরিমাণ ঠিক্ করা হয়। যে-কম্পাসের ছবি নেওয়া গেল, তাহাকে বলা হয়, অধঃপতন-দর্শক (Inclination) কম্পাস্। দিক্‌পতন যেমন পৃথিবীর সব জায়গায় সমান থাকে না, কাঁটার অধঃপতনেও ঠিক তাহাই দেখা যায়। দিক্‌পতনের মতো চুম্বকের অধঃপতনেরও মানচিত্র আঁকা থাকে।

পৃথিবীর যত উত্তরে যাওয়া যায়, কাঁটার উত্তর-মেরু ততই নীচে নামে। শেষে এমন একটা জায়গায় পৌঁছানো যায়, যেখানে কাঁটা ঠিক্ লম্বালম্বি ভাবে দাঁড়ায়। এই জায়গাটা কোথায়, বোধ করি তোমরা জানো না। কানাডার উত্তরে বুথিয়া ফেলিক্স (Boothia Felix) নামে একটা জায়গায় চুম্বকের কাঁটা তাহার উত্তর-মেরুকে নীচে রাখিয়া ঠিক্ খাড়া হইয়া দাঁড়ায়। অধঃপতন-দর্শক কম্পাস্‌কে লইয়া পৃথিবীর দক্ষিণ অংশে গেলে, আর এক ব্যাপার দেখা

যায়। তখন তাহার দক্ষিণ-মেরু ঘাড় নীচু করিতে আরম্ভ করে। শেষে এমন একটি জায়গায় পৌঁছানো যায়, যেখানে কাঁটার দক্ষিণ-মেরু ঠিক্ মাটির দিকে এবং



অধঃপতন-দর্শক ভালো কম্পাস

উত্তর-মেরু আকাশের দিকে আসিয়া দাঁড়ায়। পৃথিবীর খুব দক্ষিণে সাউথ্ ভিক্টোরিয়া-ল্যাণ্ড (South Victoria Land) নামে যে এক বরফ-ঢাকা দেশ রহিয়াছে, যেখানে ঐ জায়গাটি আছে। তোমরা স্যাকল্টনের

সাহেবের (Shackleton) নাম শুনিয়াছ কি? প্রায় আঠারো বৎসর আগে তিনি পৃথিবীর দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কার করিবার জন্য বাহির হইয়াছিলেন। দক্ষিণ-মেরু এত ঠাণ্ডা যে, সেখানে মানুষ বাস করিতে পারে না; তাহা সর্ব্বদাই বরফে ঢাকা থাকে। কাজেই, খাবার পাওয়া যায় না। তাই বরফ কাটিয়া চলিতে পারে, এমন জাহাজ তৈয়ারী করিয়া এবং তাহাতে অনেক খাবার বোঝাই দিয়া তিনি মেরুপ্রদেশ বেড়াইতে গিয়াছিলেন। পথে তাঁহার বিপদের অন্ত ছিল না। সে-সব কথা তিনি নিজে ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন। এই ভ্রমণ-কথা বড় আশ্চর্য্য। তোমরা ইহা পড়িয়ো। যাহা হউক এই স্যাকল্টন্ সাহেবই ভিক্টোরিয়া ল্যাণ্ডের (Victoria Land) যে-জায়গায় কম্পাসের কাঁটার দক্ষিণ-মেরু ঠিক্ মাটির দিকে মুখ রাখিয়া দাঁড়ায়, তাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

চুম্বকের কাঁটা কেন ভৌগোলিক উত্তর–দক্ষিণে দাঁড়ায় না এবং লম্বভাবে রাখিলেই বা কেন তাহার একটা প্রান্ত মুখ নীচু করে, তোমাদিগকে এখনো তাহা বলা হয় নাই। এখন তোমাদিগকে তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আগেই বলিয়াছি, বৈজ্ঞানিকেরা

আমাদের পৃথিবীটাকে একটা বড় চুম্বক বলিয়া কল্পনা করেন। এই চুম্বকের একটা মেরু থাকে উত্তরে, অন্যটা থাকে দক্ষিণে। তাই পৃথিবীর চুম্বকের মেরু সাধারণ চুম্বকের মেরুকে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত করিয়া রাখে। কিন্তু আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, পৃথিবীর চুম্বক-মেরু ঠিক্ ভৌগোলিক উত্তর-দক্ষিণে নাই। পৃথিবী-জোড়া একটা প্রকাণ্ড চুম্বককে পৃথিবীর ঠিক মাঝ দিয়া চালাইলে এবং তাহার দক্ষিণ-মেরুকে খানিকটা পশ্চিমে হেলাইয়া রাখিলে তাহা হইতে যে-রকম কাজ পাওয়া যায়, পৃথিবীর চুম্বক-শক্তিতে আমরা ঠিক্ সেই রকমেরই কাজ পাই।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। মনে কর, একটা খুব বড় চুম্বককে টেবিলের উপরে ফেলিয়া কতকটা উত্তর-পশ্চিমে হেলাইয়া রাখা গেল। এখন ইহার উপরে একটা ছোটো কম্পাস্‌কে ধরিলে কি হয় বলা যায় না কি? তখন বড় চুম্বকের দক্ষিণ-মেরুর টানে কাঁটার উত্তর-মেরু ঠিক্ উত্তরে না গিয়া চুম্বকের মতোই একটু পশ্চিমে হেলিয়া দাঁড়াইবে। কম্পাসের কাটা ঠিক্ এই রকমেই ভৌগোলিক উত্তর-দক্ষিণে না দাঁড়াইয়া একটু বাঁকিয়া

থাকে। ইহা হইলে দেখ, পৃথিবীর চুম্বক-মেরু খাঁটি উত্তর-দক্ষিণে না থাকাতেই এই বিভ্রাট।

কোনো চুম্বকের কাঁটাকে ভারকেন্দ্রে আট্‌কাইয়া লম্বভাবে (Vertically) রাখিলে, তাহার একটা মেরুকে মাথা নীচু এবং অপরটাকে মাথা উঁচু করিতে দেখা যায়। ইহার কারণ যে কি, তাহাও অনায়াসে বলা যায়। তোমরা আগে দেখিয়াছ, কোনো বড় চুম্বকের বলক্ষেত্রে একটা ছোটো কম্পাস্‌কে রাখিলে তাহার কাঁটা সেখানকার বল-রেখার মতোই বাঁকিয়া দাঁড়ায়। পৃথিবী যখন চুম্বক, তখন তাহার উত্তর ও দক্ষিণ-মেরুকে যোগ করিয়া অসংখ্য বল-রেখা চারিদিকে বিস্তৃত আছে। কিন্তু এই বল-রেখা মাটির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে থাকে না। তাই এই অধঃপতন-দর্শক কম্পাসের কাঁটা এক নিরক্ষবৃত্ত ছাড়া, অন্য কোনো জায়গায় ঠিক্ অনুপ্রস্থ-ভাবে (Horizontally) দাঁড়ায় না। এই জন্যই যত উত্তর দেশে যাওয়া যায়, বল-রেখা অনুসারে তাহার কাঁটার উত্তর-মেরু ততই মাথা নীচু করে এবং দক্ষিণ দেশে লইয়া গেলে দক্ষিণ-মেরু নত হইয়া পড়ে।

একটা উদাহরণ দিলে বোধ করি তোমরা বিষয়টি

ভালো বুঝিতে পারিবে। নদী-স্রোতের বিপরীতে মাঝিরা কি-রকমে গুণ টানিয়া নৌকা চালায়, তাহা বোধ করি তোমরা দেখিয়াছ। মাস্তুলে-বাঁধা গুণের দড়ি টানিয়া মাঝিরা ডাঙায় হাঁটিয়া চলে, আর নৌকা চলে নদীর মাঝখানটি দিয়া। আমরা যখন দড়ি বাঁধিয়া কোনো জিনিষকে টানিতে থাকি, তখন যেদিকে দড়ির টান থাকে, জিনিষটা সেই দিকেই যায়। কিন্তু নৌকায় তাহা দেখা যায় কি? গুণের দড়ি নৌকাকে ডাঙায় ভিড়াইতে চায়, কিন্তু নৌকা তাহা না মানিয়া মাঝ জল দিয়া চলে। ইহার কারণ কি? কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন নয়। নৌকায় কেবল গুণের দড়ির টান কাজ করে না; যে-মাঝিটি নৌকার হাল ধরিয়া বসিয়া থাকে, সেও নৌকায় একটি বল প্রয়োগ করে। গুণের দড়ির বল এবং হালের বল নৌকায় এক সঙ্গে কাজ করে। দোটানায় পড়িলে সকলেরি মুস্কিল হয়। যে বুদ্ধিমান্ সে দুই টানের মধ্যে কোনোটার দিকে না গিয়া মাঝামাঝি চলে। এখানে নৌকার অবস্থা কতকটা তাহাই হয়,—নৌকা গুণের টানে ডাঙার দিকে যায় না এবং হালের নির্দ্দেশে ঠিক্ মাঝ জলেও চলে না; সে চলে এই দুইয়ের মাঝামাঝি একটি রাস্তা ধরিয়া।

কেবল নৌকা নয়, যেখানে দুইটা বল কোনো জিনিষেও উপরে এক সঙ্গে কাজ করে, সেখানে তাহার মধ্যপথে চলা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। সুতরাং যাহা কোনো নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া চলিতেছে, তাহার এই গতির বলকে অন্য যে-কোনো দুই দিকে ভাগ করা যাইতে পারে।

পৃথিবীর উপরে-নীচে আশে-পাশে তাহার চুম্বক-শক্তি অসংখ্য বল-রেখা ধরিয়া কাজ করিতেছে। কাজেই, পৃথিবীর যে-কোনো দিকের চুম্বক শক্তিকে যে-কোনো দুই দিকে ভাগ করা যাইতে পারে। মনে কর, এই কলিকাতা সহরের চুম্বক-শক্তিকে অনুপ্রস্থভাবে (অর্থাৎ মাটির সহিত সমান্তরাল ভাবে) এবং লম্বভাবে (Vertically) ভাগ করা গেল। কম্পাসের কাঁটাকে তোমরা যে-বলে প্রায় উত্তর-দক্ষিণে লম্বা থাকিতে দেখ, তাহাই চুম্বকের সেই অনুপ্রস্থ শক্তি এবং যে-বলে কাঁটার মেরু মাথা নীচু করে, তাহা সেখানকার সমস্ত চুম্বক শক্তি।

বড় চুম্বকের সকল গুণই আমাদের পৃথিবীর আছে। এই কারণে সাধারণ চুম্বক যেমন তাহার কাছের লোহাতে চুম্বক শক্তির আবেশ করে, পৃথিবীর চুম্বক-শক্তিও ঠিক্ সেই রকমেই লোহাকে ও ইস্পাতকে

চুম্বক করে। তোমরা বোধ করি ইহা দেখ নাই। একটা সহজ পরীক্ষার কথা বলিতেছি। লোহার ডাণ্ডা বা অন্য কোনো লোহার জিনিষকে অধঃপতন-দর্শক চুম্বকের কাঁটার মতো করিয়া দেওয়ালের গায়ে বা অন্য কোনো জায়গায় হেলাইয়া রাখিয়া দাও। কিছু দিন পরে দেখিবে, লোহাটি চুম্বক হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে এই লোহার উত্তর-মেরু নীচে এবং দক্ষিণ-মেরু উপরে দেখা যাইবে। কেন এ-রকম ঘটে বলা কঠিন নয়। লোহাকে চুম্বকের কাঁটার মতো হেলাইয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া তাহা পৃথিবীর চুম্বক শক্তির বল রেখার সহিত সমান্তরাল হয়। ইহাতেই লোহায় চুম্বক-শক্তির আবেশ ঘটে। তোমরা আগেই দেখিয়াছ, সাধারণ লোহাতে যে চুম্বক-শক্তির আবেশ হয়, তাহা স্থায়ী হয় না,—কেবল পান দেওয়া কঠিন ইস্পাতের চুম্বক-শক্তিকেই স্থায়ী হইতে দেখা যায়। কাজেই, সাধারণ কোমল লোহা ঐ প্রকারে যে চুম্বকত্ব পায় তাহাও স্থায়ী হয় না; কিন্তু লোহাটি যখন হেলানো অবস্থায় থাকে, তখন তাহাতে দি জোরে হাতুড়ির ঘা মারা যায়, তাহা হইলে প্রায়ই উহার চুম্বকত্ব স্থায়ী হইয়া পড়ে। বড় বড় কারখানায় লোহার

কড়ি বরগা এবং পাইপ্ যেখানে-সেখানে ফেলিয়া রাখা হয়। ইহাদের মধ্যে যেগুলি একটু হেলিয়া উত্তর-দক্ষিণে থাকে, সেগুলি প্রায়ই চুম্বক হইয়া দাঁড়ায়। পৃথিবীই এই চুম্বকত্বের আবেশ করে।

পৃথিবীর চুম্বক-শক্তিতে জাহাজের কাপ্তেনকে মাঝে মাঝে ভয়ানক অসুবিধায় পড়িতে হয়। তোমাদের আগেই বলিয়াছি, কম্পাসের কাঁটাই জাহাজকে পথ দেখাইয়া দেয়। যদি ঠিক্ জায়গায় না দাঁড়াইয়া কাঁটা একটু পূর্ব্বে বা পশ্চিমে হেলিয়া পড়ে, তবে মহা-বিপদ উপস্থিত হয়। তখন জাহাজ সেই ভুল কাঁটার নির্দ্দেশে বিপথে গিয়া বিপদে পড়ে। মনে কর, একখানা জাহাজ সমুদ্রের উপর দিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে যাইতেছে। আজকালকার জাহাজের প্রায় সকল অংশই লোহা বা ইস্পাতে তৈয়ারী। উত্তর-দক্ষিণ মুখে থাকায় পৃথিবীর চুম্বক-শক্তিতে গোটা জাহাজটাই একটা চুম্বক হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রবল চুম্বক-শক্তির মধ্যে কম্পাসের কাঁটা কি ঠিক্ থাকিতে পারে? কখনই পারে না। এই অবস্থায় কাঁটা ওল্ট্-পাল্ট্ হইয়া যায়। কাজেই, ইহাতে জাহাজ চালানো কঠিন হইয়া পড়ে। কেবল উত্তর-দক্ষিণে চলিলেও যে, ইহা

ঘটে তাহা নয়। জাহাজ যখন পূর্ব্ব-পশ্চিমে চলে, তখন আবার এক নূতন বিপদ দেখা যায়। এই অবস্থায় সমস্ত জাহাজ চুম্বক হয় না বটে, কিন্তু জাহাজের যে-সব লোহার জিনিষ উত্তর-দক্ষিণে থাকে সেগুলি চুম্বক হইয়া দাঁড়ায়। ইহাও কম্পাসের কাঁটাকে এলোমেলো করিয়া দেয়। পৃথিবীর চুম্বক-শক্তিতে কাঁটার এই বিচলন বন্ধ করার জন্য কম্পাসের কাছে স্থায়ী চুম্বক ও কোমল লোহা প্রভৃতি রাখা হয়। চুম্বকক্ষেত্রে কোমল লোহা কি কাজ করে তোমাদিগকে আগেই তাহা বলিয়াছি। লোহা সেখানকার অনেক বল-রেখাকে টানিয়া নিজের কাছে আনে। তাই কম্পাসের কাছে কোমল লোহা রাখিলে তাহা পৃথিবীর চুম্বক-শক্তির বল-রেখাগুলিকে টানিয়া রাখে। কাজেই, সেগুলি আর কম্পাস্‌কে ছুঁইতে পারে না।

যে-সব কারখানায় বড় বড় ডাইনামোতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, সেখানে ঘড়ি রাখা দায় হয়। ঘড়ির কাঁটা স্প্রিং প্রভৃতি ইস্পাত দিয়া তৈয়ারী থাকে। আবার ডাইনামোতে খুব প্রবল বৈদ্যুত-চুম্বক সর্ব্বদাই কাজ করে। কাজেই, বৈদ্যুত-চুম্বকের শক্তিতে ঘড়ির কাঁটা স্প্রিং সবই চুম্বক হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে কাঁটায়

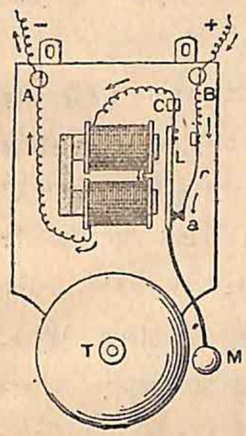
কাঁটায় এবং স্প্রিংএ ও চাকায় আকর্ষণ বিকর্ষণ চলে। সুতরাং ঘড়িতে ঠিক সময় পাওয়া যায় না; কখনো কখনো ঘড়ি বন্ধ হইয়াও যায়। এই অসুবিধা দূর করার জন্য এন্‌জিন্ ঘরে যে ঘড়ি থাকে তাহাকে কোমল লোহার আবরণে ঢাকিয়া রাখা হয়। কেন ইহা করা হয়, বোধ করি তোমরা তাহা বুঝিতে পারিয়াছ। বৈদ্যুত-চুম্বকের বল-রেখাগুলিকে লোহার আবরণ নিজের কাছে টানিয়া রাখে,—সেগুলি আর ঘড়ির কাঁটা বা স্প্রিংকে ছুঁইতে পারে না।

বৈদ্যুত ঘণ্টা

ইলেক্‌ট্রিক্‌ বেল্‌ (Electric Bell) অর্থাৎ বৈদ্যুত ঘণ্টা তোমরা হয় ত দেখিয়াছ। টেলিফোনে এই ঘণ্টা-লাগানো থাকে, এধারে কল টিপিলে তিন-চারি মাইল তফাতের ঘণ্টা বাজিয়া উঠে। বড় বড় বাড়িতে কাহাকেও ডাকিতে গেলে চারিতলার উপরে কল টিপিলে একতলা ঘরের ঘণ্টা আপনিই বাজে। আজকাল রেল ষ্টেশনেও বৈদ্যুত ঘণ্টা লাগানো থাকে। তোমরা বোধ হয় জানো না, এই ঘণ্টা বৈদ্যুত-চুম্বক দিয়া চলে। কি-রকমে ইহা তৈয়ারী করা হয় এবং কি-রকমেই বা ইহার কাজ চলে তোমাদিগকে এখন সেই কথাটা বুঝাইয়া বলিব।

পরপৃষ্ঠায় একটি বৈদ্যুত ঘণ্টার ছবি দিলাম। ইহার উপরকার ঢাক্‌নি উঠাইয়া ফেলিলে ভিতরে যে কল দেখা যায় তাহাই এখানে আঁকিয়া দিয়াছি। দেখ, ইহাতে একটি বৈদ্যুত-চুম্বক লাগানো আছে। বাঁকানো কোমল লোহার দুই শাখায় যে তার জড়ানো আছে,

তাহার দুই প্রান্ত A এবং B চিহ্নিত দুইটি স্ক্রুপে ঠেকিয়াছে। এই স্ক্রুপ দুটির সঙ্গেই আবার বিদ্যুৎ-কোষের দুই প্রান্ত লাগানো আছে। মনে রাখিয়ো, কোষের বিদ্যুৎ তার দিয়া আসিয়া যতক্ষণ বৈদ্যুত-চুম্বকের বেষ্টনীর তারে চলে, ততক্ষণ বেষ্টনীর ভিতরকার কোমল লোহা চুম্বক হইয়া দাঁড়ায়। তখন ইহা কাছের লোহার জিনিষকে টানিয়া ধরিতে পারে। বেষ্টনীর তারে যখন বিদ্যুৎ চলে না, তখন তাহার ভিতরকার কোমল লোহাতে একটুও আকর্ষণ-শক্তি দেখা যায় না। ছবির L-চিহ্নিত অংশ কোমল লোহার একটি পাত এবং 'C' একটি লোহার স্প্রিং। এই স্প্রিংএর উপরে L পাশাপাশি খেলিয়া বেড়াইতে পারে। দেখ, "L" পাতের সঙ্গে "M" মুগুর লাগানো আছে। যখন "L" খেলিয়া বেড়ায়, তখন সেটি "T"-চিহ্নিত ঘণ্টায় ঘা দেয়। ইহাতে ঘণ্টা টুন্‌টুন্ করিয়া বাজে। তার



বৈদ্যুত ঘণ্টা

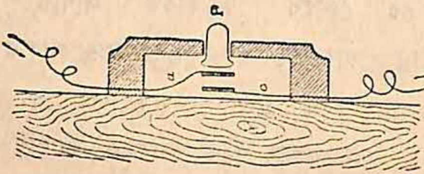
পরে কলের "a"-চিহ্নিত জায়গাটি দেখ। এখানে কোমল লোহা "L" "B" স্ক্রুর তারের সঙ্গে আল্‌গাভাবে লাগানো আছে। যখন "C" স্প্রিংএর উপরে দাঁড়াইয়া "L" কাঁপিতে থাকে, তখন "B" স্ক্রুপের তারের সঙ্গে ঐ "a" বিন্দুতে উহার একবার সংযোগ এবং পরক্ষণেই বিয়োগ ঘটে।

এখন মনে কর, কোনো বিদ্যুৎ-কোষের দুইটি তার যেন A এবং B স্ক্রুপে লাগানো হইয়াছে এবং তাহার বিদ্যুৎ "B" তারের সাহায্যে ভিতরে ঘুরিয়া যেন "A" তার দিয়া বাহিরে আসিতেছে। এই অবস্থায় কি হইবে বলা যায় না কি? বিদ্যুৎ B হইতে বাহির হইয়া এবং a, L এবং C-এর ভিতরে চলিয়া বৈদ্যুত-চুম্বকের বেষ্টনীর তারের মধ্যে প্রবেশ করিবে। তার পরে বেষ্টনীর তার ঘুরিয়া A স্ক্রু দিয়া বাহিরে আসিবে। বেষ্টনীর তার দিয়া বিদ্যুৎ চলিলেই তাহার ভিতরকার কোমল লোহা চুম্বক হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই, ঐ কোমল লোহা "L"-কে টানিতে থাকিবে এবং তাহাতে "M" মুগুর "T" ঘণ্টায় ঠেকিয়া একটা শব্দ করিবে। তোমাদের আগেই বলিয়াছি "a" বিন্দুর সঙ্গে "L" স্থায়ীভাবে সংযুক্ত থাকে না,—কেবল ছুঁইয়া থাকে

মাত্র। কাজেই যখন "L"কে বৈদ্যুত-চুম্বক কাছে টানিয়া আনে, তখন "a" বিন্দুতে ফাঁক হয়। ইহার ফলে বেষ্টনীর ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলা বন্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থায় বেষ্টনীর কোমল লোহা চুম্বক-শক্তি হারাইয়া আর "L"-কে টানিয়া রাখিতে পারে না,—তাহা স্প্রিংএর জোরে ছিট্‌কাইয়া আবার "a"-এর গায়ে লাগে। কাজেই, তখন বেষ্টনীতে আবার বিদ্যুৎ চলিতে আরম্ভ করে এবং তাহাতে আবার "L"-এ টান্ পড়ে। এই রকমে ঠিক্ আগের মতোই মুগুরটা ঘণ্টায় আর একটা ঘা দেয়। এই প্রক্রিয়ায় আঘাতের পরে আঘাত পাইয়া ঘণ্টা টুন্‌টুন্ করিয়া বাজিতে থাকে। দেখ, বৈদ্যুত চুম্বকের গুণ লইয়া কেমন সুন্দর যন্ত্র তৈয়ার করা হইয়াছে। তোমরা বৈদ্যুত-ঘণ্টা কাছে পাইলে ভিতরকার কল স্বচক্ষে দেখিয়ো।

কোষের বিদ্যুতের দুইটি তার যদি সর্ব্বদাই "A" এবং "B" স্ক্রুর সঙ্গে লাগানো থাকে, তবে দিবারাত্রিই ঘণ্টা বাজিয়া কাণ ঝালাপালা করে। তাই দরকার মতো একটা বোতাম টিপিয়া ঘণ্টা বাজাইবার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন হয়। তোমরা এই বোতাম বা সুইচ দেখ নাই কি? বোতাম প্রায়ই দেওয়ালের গায়ে

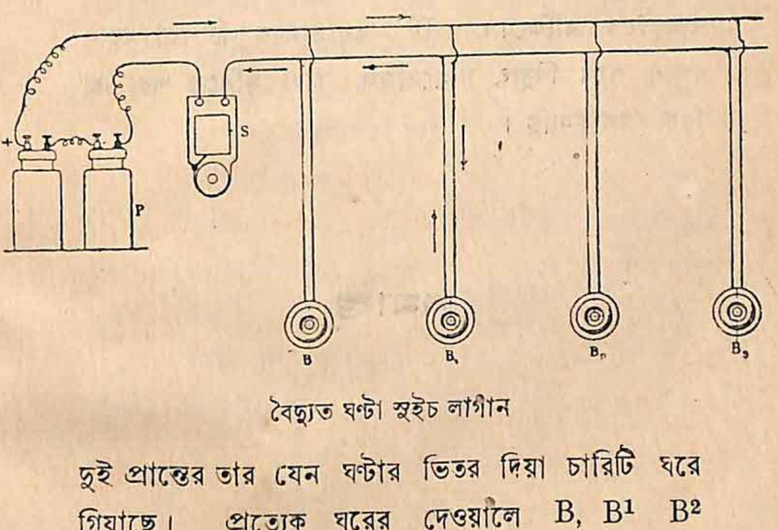
লাগানো থাকে। তাহাতে টিপ্ দিলেই অন্য ঘরে বা অন্য বাড়িতে যে ঘণ্টা আছে তাহা আপনিই বাজিয়া উঠে। এখানে সুইচের একটা ছবি দিলাম। বিদ্যুৎ-কোষের তারের যে-দুই প্রান্ত "A" এবং



"B" স্ক্রুতে আঁটা থাকে, তাহারি একটার ভিতরে সুইচ্ আঁটা হয়। ছবির "a" একটি ধাতুর ফলক এবং "c" একটা লোহার স্প্রিং। দেখ, ইহাদের মধ্যে বেশ একটু ফাঁক রহিয়াছে। কাজেই "a" এবং "c" এর সঙ্গের যে-দুইটা তারের সংযোগ আছে, ঐ ফাঁকের জন্য তাহাদের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চলিতে পারে না। সুতরাং এই অবস্থায় কোষের বিদ্যুৎ ঘণ্টার ভিতর দিয়া চলে না, এবং ঘণ্টাও বাজে না। কিন্তু যেই "p" বোতামকে এবং "a" ও "c"কে একত্র করা যায়, অমনি বিদ্যুৎতের চক্র সম্পূর্ণ হইয়া যায়।

তখন কোষের বিদ্যুৎ ঘণ্টার ভিতরে চলিয়া তাহাকে বাজাইতে থাকে।

এখানে যে ছবিটি দেওয়া গেল, তাহা দেখিলে আগের কথাগুলি তোমরা ভালো বুঝিতে পারিবে। দেখ, ছবিতে "p" চিহ্নিত দুইটি বিদ্যুৎ-কোষ এবং "s" চিহ্নিত একটা বৈদ্যুত ঘণ্টা আঁকা আছে। কোষের



বৈদ্যুত ঘণ্টা স্থইচ লাগান

দুই প্রান্তের তার যেন ঘণ্টার ভিতর দিয়া চারিটি ঘরে গিয়াছে। প্রত্যেক ঘরের দেওয়ালে B, B^1 B^2 এবং B^3 এই চারিটি স্থইচ্ আছে। ঘরে ঘরে কি-রকমে তারগুলি খাটানো আছে তাহা ছবি দেখিলেই বুঝিবে।

সুইচের বোতামগুলিই কোষের প্রান্তের তারগুলিকে সংযুক্ত থাকিতে দেয় নাই। কাজেই, কোষের বিদ্যুৎ এই অবস্থায় ঘণ্টার ভিতর দিয়া যাইবে না,—ঘণ্টাও বাজিবে না। এখন মনে করা যাউক, যেন আমরা B^1 বোতামকে টিপিয়া ধরিয়াছি। টিপিবামাত্র তারের মধ্যে যে বিচ্ছেদ ছিল, তাহা আর রহিল না। সুতরাং কোষের বিদ্যুৎ এখন ঘণ্টার ভিতরে চলিয়া ঘণ্টাকে বাজাইতে থাকিবে। B^1 বোতামকে টিপিয়া ধরায় কোন্ পথে বিদ্যুৎ চলিতেছিল, তাহা ছবিতে শর-চিহ্ন দিয়া দেখাইয়াছি।

সমাপ্ত

রায়-সাহেব

শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়

প্রণীত গ্রন্থাবলী

১।	গ্রহ-নক্ষত্র	১৸০
২।	প্রাকৃতিকী	২৲
৩।	বৈজ্ঞানিকী	১॥০
৪।	পোকা-মাকড়	২৲
৫।	প্রকৃতি-পরিচয়	১॥৴০
৬।	বিজ্ঞানের গল্প	১৲
৭।	আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার	১॥০
৮।	পাখী	১৲
৯।	বাংলার পাখী	১॥০
১০।	শব্দ	১৲
১১।	মাছ, ব্যাং সাপ ...	১॥০
১২।	আলো	২৲

প্রাপ্তিস্থান :—
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।